এই বংশের নাম 'ইন্দো-ইউরোপীয়' থেকে এ কথা মনে হতে পারে যে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যেই এই বংশের ভাষাগুলি সীমাবদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে আফ্রিকা, আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশেরও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে এ বংশের ভাষাগুলি। ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য গ্রিক ভাষা; হোমারের দুটি মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি এই ভাষাতেই রচিত। ক্রিট দ্বীপে প্রাপ্ত গ্রিক ভাষার নিদর্শনটি প্রায় ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ইতালীয় শাখার প্রধান ভাষা ল্যাটিন যা রোম সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির নিদর্শন। ইতালীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফরাসি ভাষা ফ্রান্স ছাড়াও বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় প্রচলিত। স্প্যানিশ বলা হয় স্পেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকায়। এছাড়াও ইতালিয়ান, পর্তুগিজ ইত্যাদি ভাষা ইতালীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিউনিশীয় বা জার্মানিক শাখা থেকে এসেছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি প্রধান ভাষা। জার্মানিক শাখার উত্তর জার্মানিক উপশাখা থেকে এসেছে সুইডেনের ভাষা সুইডিশ; পশ্চিম জার্মানিক থেকে ডাচ্, ফ্লেমিশ, জার্মান এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ইংরেজি ভাষা। কেলতিক ভাষাগুলির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে সমৃদ্ধ আয়ারল্যান্ডের ভাষা আইরিশ। বালতো-শ্লাভিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলি হল লিথুয়ানিয়ার ভাষা, বুলগেরিয়ার বুলগেরীয়, চেক, শ্লোভাক, পোলিশ ও রুশভাষা। এশিয়া মাইনর ও ককেশাস অঞ্চলে প্রচলিত আরমেনীয় এবং মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত তোখারীয়। ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—একটি শাখা 'ইরানীয় আর্য' হিসেবে ইরানে প্রবেশ করে, অন্যটি 'ভারতীয় আর্য' নামে চলে আসে ভারতে।

ইন্দো-হিট্টি
- হিট্টি
- ইন্দো-ইউরোপীয়
  - **কেন্তুম্**: গ্রিক, ইতালীয়, কেলতিক, জার্মানিক, তোখারীয়
  - **সতম্**: ইন্দো-ইরানীয়, আলবেনীয়, আর্মেনীয়, বালতিক, স্লাভিক (বালতিক ও স্লাভিক — বালতোস্লাভিক)

ইরানীয় শাখাটি বিস্তারলাভ করে প্রায় সমগ্র প্রাচীন পারস্য জুড়ে—এলম আর মেসোপটেমিয়ার পুব দিক থেকে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত। ইরানীয় শাখা থেকে ক্রমে জন্ম নেয় দুটি প্রাচীন ভাষা—আবেস্তীয় এবং প্রাচীন পারসিক। জরথুস্ত্রীয় মতাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ্ আবেস্তা'র ভাষা আবেস্তীয় ভাষার উদাহরণ। ইরানীয় শাখারও প্রাচীনতম নিদর্শন এই 'জেন্দ্ আবেস্তা'। প্রাচীন পারসিক থেকে মধ্যযুগে পহ্লবী ভাষা ও তা থেকে আধুনিক ফারসি ভাষার জন্ম হয়। এই ইরানীয় বংশের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সদস্য হল, আফগানিস্তানের পুশ্‌তু আর বেলুচিস্তানের বেলুচি।

ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের যে শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে 'ভারতীয় আর্য' নামে, এবং যে শাখা থেকে কালক্রমে জন্ম নেয় বর্তমান ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা এমনকি বাংলাও, সেই ভারতীয় আর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব 'ভারতের ভাষাপরিবার ও বাংলাভাষা' অধ্যায়ে।

সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষা—হিব্রু ও আরবি। সেমীয় থেকে উদ্ভুত হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। ইজরায়েল দেশের সরকারি ভাষা আধুনিক হিব্রু। আরবি ভাষাও ছড়িয়ে পড়েছে আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে। হামীয় শাখার ঐতিহ্যপূর্ণ মিশরীয় ভাষা এখন লুপ্ত। তবে উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া ও সাহারা অঞ্চলে তমশেক্, কাবিল ভাষা ইত্যাদি এবং ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যান্ডে হামীয় শাখার সন্ততিরা রয়ে গেছে।

সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের বাইরে আফ্রিকার সব ভাষাগোষ্ঠীকে 'বান্টু' নামে অভিহিত করা হলেও মূলত দুটি ভাষাগোষ্ঠী দেখা যায়, নাইজার-কঙ্গো পরিবার এবং চারিনিল পরিবার। 'নাইজার-কঙ্গো' পরিবারের প্রচুর সংখ্যক ভাষার মধ্যে সোয়াহিলি, কঙ্গো, নিয়াঞ্জা, লুবা, জুলু ভাষা উল্লেখযোগ্য। নিল নদীর উত্তর দিকে চারিনিল পরিবারের দিন্‌কা, মাসাই, মোরু, নুবা ভাষাগুলি প্রচলিত। এছাড়াও আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে পিগমিদের ভাষাগুলি হটেনটট্-বুশ্‌ম্যান বংশের অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মতো রয়ে গেছে ফিনো-উগ্রীয় ভাষাবংশ। হাঙ্গেরির ভাষা মজর বা হাঙ্গেরীয়, ফিনল্যান্ডের ভাষা ফিনিস, এস্তোনিয়ার ভাষা এস্তোনীয়, সাইবেরিয়ার মরু অঞ্চলে সাময়েদ, অব উগ্রিক ভাষা ফিনো-উগ্রীয় বা উরাল ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। রাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ককেশাস অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ভাষা ককেশীয় বংশের, যার মধ্যে জর্জীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকা মহাদেশে এত ভাষা ও তার বৈচিত্র্য, যে ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্পষ্টতই কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেননি। আমরা প্রথমে উত্তর আমেরিকার কথায় আসি। উত্তর আমেরিকার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ মায়া ও আজতেক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে পাওয়া গেছে প্রচুর লিখিত উপাদান। এখনও আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় এই মায়া ভাষা। আর আজকের সভ্যতার ভাষা উটো আজতেক বংশের। এছাড়া আলগনকিয়াক (উত্তর আমেরিকার পূর্ব অংশে), ইরোকুইস আথাবাস্কান, হাইডা, সিয়োস্ক, আলজিক ইত্যাদি।

দক্ষিণ আমেরিকায় মায়া ও আজতেক সভ্যতার মতো ছিল আরেকটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা, ইনকা। ইনকারা যে 'কিচুয়া' ভাষা ব্যবহার করত, তা ইনকা সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ আমেরিকার আরেকটি বিখ্যাত ভাষাবংশ আরাওয়াক—এই বংশের ভাষাগুলি ছড়িয়ে পড়ে অ্যানটিলিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত। এছাড়া ক্যারিব, তুপি-গুয়ারানি, তাকানান ইত্যাদি ভাষাগোষ্ঠীর কথা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এস্কিমো-আলেউট পরিবার উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা উভয় মহাদেশেই প্রচলিত।

এই এস্কিমো-আলেউট অবশ্য প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় উত্তর মেরুর সীমান্ত অঞ্চলে।

অবর্গীভূত ভাষা :

এতগুলি ভাষা পরিবারের যে কথা বলা হল, এর বাইরেও কিন্তু রয়ে গেছে অনেকগুলি ভাষা। এইসব ভাষাকে কোনো সূত্রেই বর্গীভূত করা সম্ভব হয়নি। কারণ এই ভাষাগুলির মধ্যে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সাদৃশ্য পাওয়া যায়নি, বা কিছু পাওয়া গেলেও এমন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ বা সূত্র স্থাপন করা যায়নি, যার মাধ্যমে বংশ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এই ভাষাগুলিকে তাই অবর্গীভূত বা অশ্রেণিবদ্ধ ভাষা বা Unclassified Language বলে। জাপানি, কোরীয়, বাস্ক ইত্যাদি হল অবর্গীভূত ভাষার উদাহরণ। জাপানি ভাষা এবং কোরীয় ভাষাকে অনেকে আলতাই গোষ্ঠীভুক্ত করতে চেয়েছেন। আলতাই গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এই দুই ভাষার

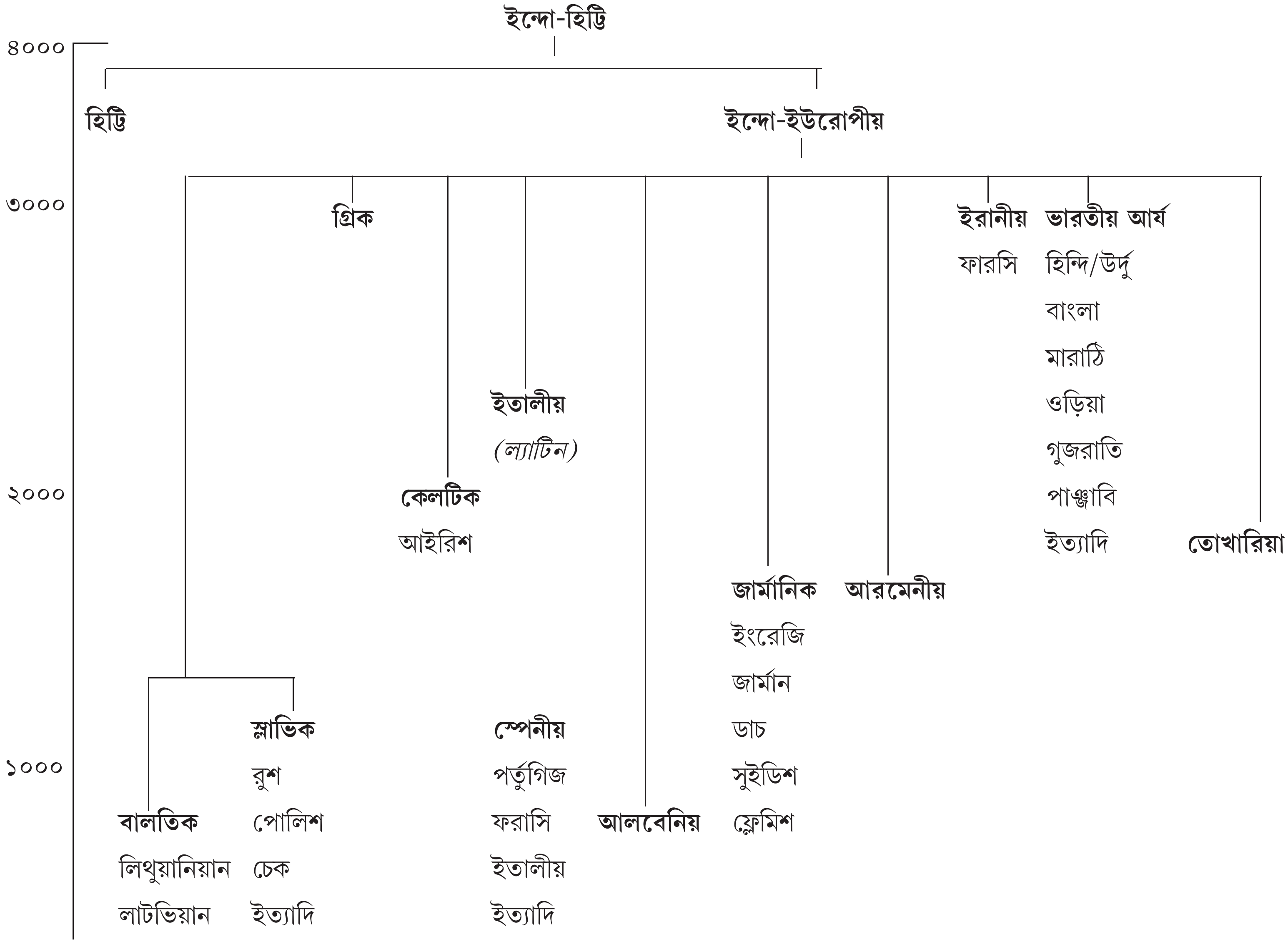

৪০০০
৩০০০
২০০০
১০০০
ইন্দো-হিট্টি
হিট্টি
ইন্দো-ইউরোপীয়
গ্রিক
কেলটিক
আইরিশ
ইতালীয়
(ল্যাটিন)
স্পেনীয়
পর্তুগিজ
ফরাসি
ইতালীয়
ইত্যাদি
বালতিক
লিথুয়ানিয়ান
লাটভিয়ান
স্লাভিক
রুশ
পোলিশ
চেক
ইত্যাদি
আলবেনিয়
জার্মানিক
ইংরেজি
জার্মান
ডাচ
সুইডিশ
ফ্লেমিশ
আরমেনীয়
ইরানীয়
ফারসি
ভারতীয় আর্য
হিন্দি/উর্দু
বাংলা
মারাঠি
ওড়িয়া
গুজরাতি
পাঞ্জাবি
ইত্যাদি
তোখারিয়া

সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি অনেক। তাই এই অভিমত গ্রহণ করা যায় না। জাপানি ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও তাতে চিনা সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপির প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোরীয় ভাষার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী মোঙ্গল-মাঞ্চু ভাষার প্রভাব আছে এবং কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পর সেখানেও চিনা ভাষার প্রভাব পড়ে। পিরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিমে ফ্রান্স ও স্পেনে বাস্ক ভাষা প্রচলিত। ফিনো-উগ্রীয় ভাষাবংশের সঙ্গে আপাতসাদৃশ্য থাকলেও কোনো নির্দিষ্ট ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় উপমহাদেশে কয়েকটি অবর্গীভূত ভাষা পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বুরুশাস্‌কি বা খজুনা, আন্দামানে প্রচলিত আন্দামানি, মায়ানমারের করেন্‌ ও মন্‌ এই ধরনের ভাষা।

এতক্ষণ যত ভাষার কথা বলা হল, বর্গীভূতই হোক বা অবর্গীভূত, এ সবই স্বাভাবিক ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর নানা স্থানে এমন ভাষারও সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলিকে ঠিক স্বাভাবিক ভাষা বলা যায় না। এই অস্বাভাবিক ভাষাগুলির জন্ম স্বাভাবিক ভাষারই মিশ্রণে। এই অস্বাভাবিক ভাষার উদাহরণ হল মিশ্র ভাষা এবং কৃত্রিম ভাষা।

মিশ্র ভাষা :

নানা কারণে একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যদি কোনো এক বিশেষ অঞ্চলে এসে জড়ো হয়, তখন সেই দুই বা তার বেশি ভাষার মধ্যে মিশ্রণ ঘটে, এবং এক মিশ্র ভাষার জন্ম হয়। এই মিশ্র ভাষায় একাধিক ভাষার ভাষিক উপাদান পাশাপাশি বজায় থাকে, তবে উন্নত ভাষার প্রাধান্য দেখা দিতে পারে। এই ধরনের ভাষায় ব্যাকরণের কোনো সুষ্ঠু নিয়ম বজায় থাকে না। কোনো একটি ভাষার নিয়ম সরাসরি ব্যবহৃত হয়। শব্দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। মিশ্র ভাষার শব্দভাণ্ডার সীমিত এবং এই ভাষাগুলি সাধারণত কথ্যরূপেই বেশি ব্যবহৃত হয়, লিখিত সাহিত্যের বিকাশের সম্ভাবনা কম থাকে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এই মিশ্র ভাষার ক্ষেত্রে দুটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন: ১. পিজিন (Pidgin) ও ২. ক্রেওল (Creole)। পিজিন প্রধানত ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ বিস্তারের ফল। 'পিজিন ইংলিশের পিজিন শব্দটি এসেছে ইংরেজি বিজ্‌নেস শব্দের চিনীয় উচ্চারণ থেকে।'* আসলে ব্যাবসার কারণেই দুটি ভাষা কাছাকাছি আসে এবং মিশে যায়। এর ফলে পিজিন দীর্ঘস্থায়ী নয়। যেখানে ইংরেজরা ব্যাবসার জন্য গেছে, সেখানে 'পিজিন ইংলিশ'-এর উদ্ভব হয়েছে, তেমনি ফরাসিরা গেলে সেখানে জন্ম নিয়েছে 'ফ্রেঞ্চ পিজিন'।

পিজিন সবসময়ই সংযোগ-সংস্পর্শের ফলে উদ্ভূত ভাষা, কখনোই মাতৃভাষা নয়। কাছাকাছি-আসা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পিজিন ভাষাটি লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ভিয়েতনামে ব্যবহৃত ফরাসি-পিজিন লোপ পেয়েছে, লোপ পেয়েছে পিজিন-ইংরেজিও। কিন্তু কোনো পিজিন যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে কোনো গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পরিণত হয় তখন তা হয়ে যায় ক্রেওল। সেক্ষেত্রে পিজিনের সীমিত শব্দভাণ্ডার ক্রমশ সুগঠিত হয়, তৈরি হয় নির্দিষ্ট ব্যাকরণ। গড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়াকে বলে Creolization। ক্রেওল পিজিন থেকেই তৈরি হয়, ক্রেওল পিজিনেরই পরিণতি বা বিকাশ।

প্রাচীন মিশ্র ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিচ-লা-মার, পিজিন-ইংরেজি, মরিশাস ক্রেওল এবং চিনুক। এর মধ্যে পিজিন-ইংরেজি-র কথা আগেই বলেছি। চিনের উপকূল বন্দরে, জাপানে পিজিন-ইংরেজির প্রচলন ছিল।

---

* অনিমেষ কান্তি পাল, ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা, প্রজ্ঞাবিকাশ

বিচ-লা-মার হল ইংরেজি ভাষার সঙ্গে স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ভাষার মিশ্রণ। বিচ-লা-মার ব্যবহৃত হত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। ভারত মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপে ভাষা-মিশ্রণের দারুণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। প্রথমে এই দ্বীপটি ফরাসিদের অধিকারে আসে। পরে শ্রমিক হিসেবে আসে মাদাগাসকার দ্বীপের মানুষ। প্রধানত ফরাসি ভাষার সঙ্গে মিশে যায় মাদাগাসকার ভাষা। এরপরে আখচাষের জন্য আসে ভারত থেকে প্রচুর শ্রমিক। ফরাসি ও মাদাগাসকারি ভাষার মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল মরিশাস ক্রেওল। পরে মরিশাস ক্রেওলে ঢুকে পড়ে অন্য ভাষার শব্দ। অষ্টাদশ শতকে উত্তর আমেরিকার ওরেগন অঞ্চলে জন্ম হয়েছিল চিনুক-এর। কয়েকটি আদিম আমেরিকার ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ফরাসি এবং ইংরেজি শব্দ।

কৃত্রিম ভাষা :

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত এতগুলি ভাষা সমস্ত মানুষের পক্ষে মনের ভাব আদানপ্রদানের পরিপন্থী। সেইজন্য এক জায়গার মানুষ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গেলে তাকে শিখতে হয় মাতৃভাষা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভাষা। ভাষার এই বিভিন্নতার জন্যই রয়ে গেছে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ, মানসিক দূরত্ব। এই নিয়ে একটি গল্প আছে বাইবেলে। মানুষ এমন একটি মিনার তৈরি করেছিল যা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল দেবতাদের বাসভূমি স্বর্গকে। এতে দেবতারা বিপন্নবোধ করেন এবং এমন একটি কৌশল তাঁরা নেন যাতে এই মিনার তৈরি ভেস্তে যায়। একদিন দেখা গেল যাঁরা মিনার তৈরি করেছিলেন তাঁরা কেউই একে অপরের ভাষা বুঝতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত সত্যিই ভেস্তে গেল মিনার তৈরি। এই গল্প থেকে বোঝা যায় ভাষার পার্থক্যে কীভাবে বিচ্ছিন্নতা নেমে আসে মানুষের মধ্যে। এই বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে ঐক্যের সন্ধানেই কৃত্রিম ভাষা তৈরির কথা বলেছিলেন দার্শনিক রেনে দেকার্ত, ফ্রান্সিস বেকন, জন উইলকিন্স। উনিশ শতকে যোহান মার্টিন শ্লেইয়ার 'ভোলাপুক' নামে একটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন। শ্লেইয়ারের এই বিশ্বভাষা নির্মাণের কথা মাথায় আসে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। একজন জার্মান কৃষকের ছেলে আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানে জীবিকানির্বাহ করতে থাকে। এদিকে এই কৃষক হঠাৎই পড়ে যায় চরম অর্থসংকটে। সে যতই ছেলেকে চিঠি লেখে, ছেলের থেকে কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। আসলে আমেরিকার ডাকবিভাগের লোকেরা জার্মান কৃষকের লেখা পড়তে পারে না, বুঝতে পারে না। ফলে কোনো চিঠিই পৌঁছায়নি তার ছেলের কাছে। এই ঘটনা শুনে শ্লেইয়ারের মনে হয়, এমন এক বিশ্বজনীন বর্ণমালা প্রয়োজন যা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যবহারযোগ্য হবে।

১৮৮৭ সালে পোল্যান্ডের চক্ষুচিকিৎসক এল. এল. জামেনহফ আরেকটি কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন। রুশ ভাষায় তিনি যে প্রস্তাবটি লেখেন সেখানে তিনি ব্যবহার করেন ছদ্মনাম Doktoro Esperanto,যার অর্থ Doctor Hopeful। এই নাম থেকেই তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্বভাষার নাম হয় এসপেরান্তো।

বর্তমান পৃথিবীতে কুড়ি লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে পারে, যার মধ্যে প্রায় এক হাজার লোকের মাতৃভাষা এসপেরান্তো। জামেনহফ প্রধানত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির উপর ভিত্তি করেই এই এসপেরান্তো ভাষা গড়ে তোলেন। ধ্বনির ক্ষেত্রে স্লাভ এবং রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে রোমান ও জার্মানিক ভাষাগুলির প্রভাব পড়েছে। এসপেরান্তোর সুবিধে হল এর শব্দগুলি উচ্চারিত হয় উচ্চারণ অনুযায়ী। এর ব্যাকরণও সহজ, মাত্র ১৬টি সূত্রের মাধ্যমে এই ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব। এই ভাষায় ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ৫টি স্বরধ্বনি, ২টি অর্ধস্বর এবং ৬টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। ৯২১টি শব্দমূলের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয়/বিভক্তি যোগ করে শব্দ তৈরি হয়। এ ভাষায় শব্দসংখ্যা ৬০০০-এরও বেশি।

কয়েকটি এসপেরান্তো শব্দ উদাহরণ হিসেবে নীচে দেওয়া হল—

English	**Esperanto**
Hello	Saluton
Yes	Jes
No	Ne
Good morning	Bonan matenon
Good night	Bonan nokton
Please	Bonvolu
What is your name?	Kio estas via nomo?
I love you	Mi amas vin
Thank you	Dankon

এসপেরান্তো-কে সংস্কার করতে চেয়ে আরও বেশ কয়েকটি কৃত্রিম বিশ্বভাষার জন্ম হয়েছিল, যেমন Ido, Occidental, Novial, Interglosa (পরবর্তীকালে যা Glosa), Interlingua ইত্যাদি। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ওটো ইয়েসপারসন-এর চিন্তার ফসল Novial, যেটি আবার গড়ে উঠেছিল Esperanto, Ido ও Occidntal-এর নানান বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণে। কিন্তু এ ভাষাগুলি কোনোটাই ছাপ ফেলতে পারেনি জনমানসে এবং দ্রুতই হারিয়ে গেছে।

এই রকম ভাষা ব্যবহার না করেও মানুষ নানাভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে। মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' তো আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে কেবলমাত্র চোখের সাহায্যেও এভাবে ভাষা চালাচালি সম্ভব। মাথা, হাত, চোখ প্রভৃতি অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে এই যে ভাষা ব্যবহার, একে ভাষাতাত্ত্বিকেরা নাম দিয়েছেন Para Language। এই ধরনের ভাষাকে নির্ভর করেই মূলত মূক ও বধির মানুষদের জন্য তৈরি হলো এক বিশেষ সাংকেতিক ভাষা Sign Language। ১৭৭৫ সালে ফরাসি শিক্ষাবিদ Abbe′ Charles Michel de I'Epe′e প্রথম এই ধরনের ভাষা উদ্ভাবন করেন। এরপর Thomas Gallandet, Laurent Clerc, Richard Paget, Pierre Gorman প্রমুখ শিক্ষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় বর্তমানে Sign Language বিশ্বজুড়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। যখন কোনো সাংকেতিক ভাষা বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে তখন কথ্যভাষার মতোই তার মধ্যেও নানা ভাষাবৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে, এমনকি নতুন সাংকেতিক ভাষাও তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয়, কথ্য ও লিখিত ভাষার প্রভাবও পড়তে পারে এই ভাষায়, এমনকি তৈরি হতে পারে পিজিনও।

Sign Language-গুলির মধ্যে অন্যতম Paget-Gorman পদ্ধতি। প্রায় ৩,০০০ সংকেত-সমন্বিত এই ভাষায় 'ক্রিয়া', 'পশু', 'রং', 'আধার', 'খাদ্য' প্রভৃতি কতগুলি মৌলিক বিষয়ভিত্তিক কিছু সংকেত রয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন শব্দ বোঝানোর জন্য সেই বিশেষ মৌলিক সংকেতটির সঙ্গে আরও একটি চিহ্ন জুড়ে শব্দটি বোঝানো সম্ভব। যেমন, 'নীল'-শব্দটি বোঝাতে একটি হাতে 'রং'-সূচক সংকেতটি দেখিয়ে অন্য হাতে আকাশ চিহ্নিত করে বোঝানো হয় নীল রং।

British

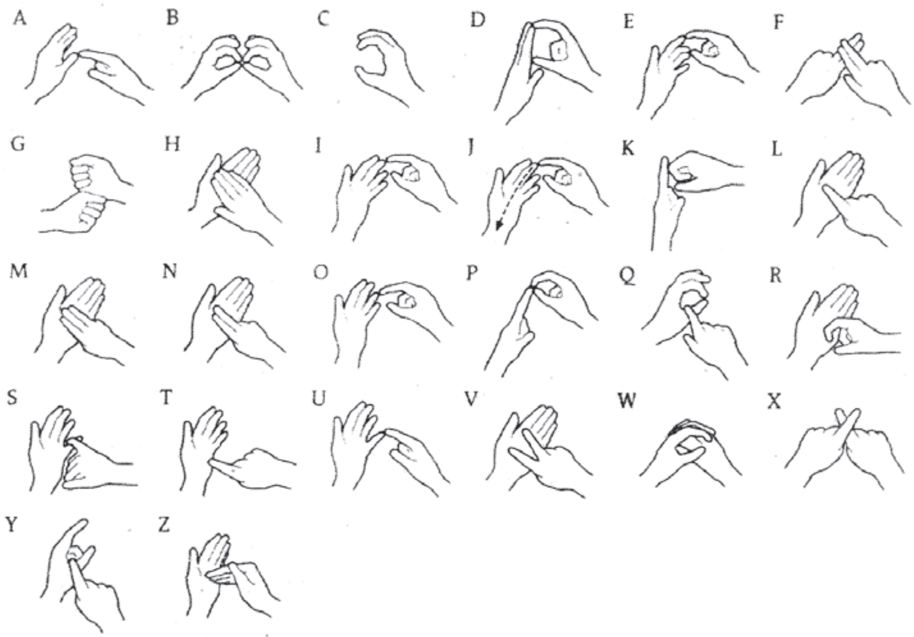

American

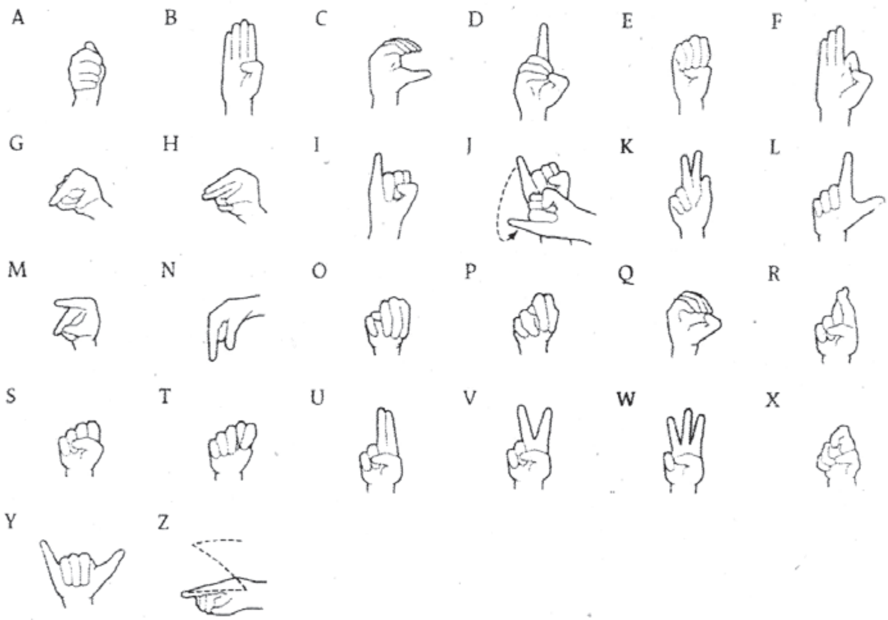

* কৃতজ্ঞতা : ডেভিড ক্রিস্টালের 'হাউ দ্য ল্যাংগুয়েজ ওয়ার্কস্

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে 'আমের-ইন্দ' নামের একটি এই ধরনের ভাষা দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। Madge Skelly এই পদ্ধতিটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতিকে সাধারণভাবে বলা হয় 'hand-talk' বা হাত দিয়ে কথা বলা পদ্ধতি।

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল আঙুল দিয়ে বানান করে শব্দ বোঝানোর পদ্ধতি। একে ইংরাজিতে বলে finger spelling বা Dactylology। এই পদ্ধতিতে সাধারণ বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের জন্য একটি করে পৃথক চিহ্ন বা হাতের মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশরা এক্ষেত্রে দুটি হাত ব্যবহার করেন, আমেরিকান বা সুইডিশ পদ্ধতিতে আবার একটি হাতই ব্যবহার করা হয়। এর সুবিধে অনেক।

Paget-Gorman পদ্ধতিতে অনেক শব্দই বোঝানো যায় না। স্থান বা নারীপুরুষ বোঝানো সম্ভব হলেও 'বেলপাহাড়ি' বা 'সুচিত্রা সেন' শব্দ দুটি এই পদ্ধতিতে বোঝানো যাবে না। finger spelling পদ্ধতিতে কিন্তু তা সহজেই বোঝানো যেতে পারে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান পদ্ধতির তুলনামূলক দুটি ছবি থেকে বিষয়টি সবজেই বুঝতে পারবে। তবে এ পদ্ধতির সমস্যা হল, নিরক্ষর মানুষ বা শিশুরা এ ভাষা বুঝবে না। এই সমস্যা দূর করতে Rochester পদ্ধতিতে এখন মৌখিক ভাষা এবং আঙুল দিয়ে বানান করা—একই সঙ্গে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের ভাষাপরিবার ও বাংলা ভাষা

ভাষাগত দিক থেকে ভারত সম্বন্ধে দুটি অভিধা খুব প্রচলিত—এক, 'ভারত ভাষার অরণ্য' এবং দুই, 'ভারত চার ভাষাবংশের দেশ'।

ভারত যে ভাষার অরণ্য এ কথা উঠে এসেছিল বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে ইংরেজদের করা 'ভাষাসমীক্ষা'র ফলাফলের নিরিখে। Linguistic Survey of India 1903-1928 অনুসারে ভারতে '১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা' প্রচলিত ছিল। এই গুরুতর কাজের মূল সম্পাদক ছিলেন জর্জ গ্রিয়ার্সন। এ কথা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত যে এই সমীক্ষা পদ্ধতিগতভাবে ত্রুটিমুক্ত ছিল না, কিন্তু তাই বলে সেই সমীক্ষাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৬১ সালের জনসমীক্ষাতেও দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষার সংখ্যা প্রায় ১৬৫২টি।

এর মধ্যে অবর্গীভূত ভাষার সংখ্যা ৫৩০টি এবং অভারতীয় সংখ্যা ১০৩টি। বাকি সব ভাষাগুলি আসলে চারটি ভাষাবংশের অন্তর্গত। ইন্দো-ইউরোপীয়, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচিনা।

'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' অংশে বলা হয়েছে নৃতাত্ত্বিকদের মতে ভারতীয় জনসমূহের প্রাচীনতম স্তর নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো। এঁদের কিছু বংশধরদের সন্ধান মেলে দক্ষিণ ভারতে, পূর্ব ভারতের অঙ্গামি নাগা ও আন্দামানের কয়েকটি জনজাতির মধ্যে। নৃবিজ্ঞানে মাপজোকের যে পদ্ধতি আছে তাতে হয়তো নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জনগোষ্ঠীর হদিশ পাওয়া গেছে, কিন্তু ভাষার দিক থেকে এরকম কোনো চিহ্ন এ দেশে পাওয়া যায় না (কেবল 'বাদুড়' শব্দটিতে পণ্ডিতেরা কিছু সেরূপ চিহ্ন দেখতে পান।—ভারতের ভাষা, গোপাল হালদার)।

অস্ট্রিক ভাষাবংশ :

এরপরেই এসে থাকবে Proto-Australoid বা প্রত্ন-অস্ত্রালরা। এঁদের ভাষার নাম 'অস্ট্রিক'। বর্তমান ভারতের প্রায় ৬৫টি ভাষা এই ভাষাবংশজাত। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে এই বংশের গুরুত্ব বিচার করলে ভুল হবে, কারণ এই ভাষাবর্গের গুরুত্ব ও গৌরব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনত্বের এক দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অস্ট্রিক ভাষাবংশ ভারতের প্রাচীনতম ভাষাগোষ্ঠী। প্রাচীনতম বলেই এবং বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হলেও সারা ভারত জুড়েই অস্ট্রিক ভাষাবংশের বংশধরেরা ছড়িয়ে আছে। 'অস্ট্রিক' ভাষাবংশের বংশলতিকাটি হল—

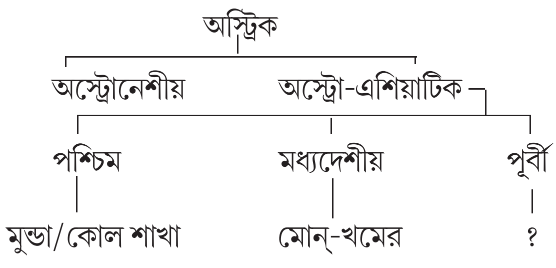

অস্ট্রিক ভাষা শুধু ভারতেই নয়, এর বিস্তার ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও। অস্ট্রিক ভাষার দুটি শাখা—১. অস্ট্রোনেশীয় এবং ২. অস্ট্রো-এশিয়াটিক। অস্ট্রোনেশীয় শাখাটিই মূলত ছড়িয়ে গেছে ভারতের বাইরে। যেমন—(ক)

ইন্দোনেশিয়ার নানা ভাষা, এর মধ্যে 'মালয়' প্রধান। (খ) মেলানেশীয় ভাষাগোষ্ঠী, যেগুলি দেখা যায় ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে। (গ) ক্যারোলাইন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা যেগুলি মাইক্রোনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং (ঘ) পলিনেশীয় ভাষা, যার মধ্যে সামোয়া, তাহিতি, হাওয়াই দ্বীপের আদিবাসীদের ভাষা।

ভারতের প্রচলিত অস্ট্রিক শাখাটি হল অস্ট্রো-এশিয়াটিক। ভারতের বাইরে উপরিউক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে অর্থাৎ অস্ট্রোনেশীয় শাখার সঙ্গে অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার ভাষাগুলির মধ্যে সার্ধম্য প্রথম তুলে ধরেন Eather W. Sehmidt।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের যে তিনটি ধারা ভারতে প্রচলিত বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, (অর্থাৎ ক. পশ্চিমা, খ. মধ্যদেশীয় এবং গ. পূর্বী) তার মধ্যে পূর্বী ধারাটির অস্তিত্ব সংশয়ের ঊর্দ্ধে নয়। তাই আমরা অন্য দুটি ধারা নিয়ে এখানে আলোচনা করব।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের পশ্চিমা ধারাটি বৃহত্তম, প্রায় ৫৮টি ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। শবর, কোরকু, খাড়িয়া, সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো, ভূমিজ প্রভৃতি পশ্চিমা শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা; ওড়িয়া আর অন্ধ্রপ্রদেশে শবর/শোরা; মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে কোরকু; বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশে খাড়িয়া; বিহার পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সাঁওতালি, মুন্ডারি; বিহার আর ওড়িশায় ভূমিজ, হো ভাষাভাষীর মানুষ দেখা যায়। এই ভাষাগুলির মধ্যেঅন্যতম প্রধান ভাষা হল সাঁওতালি/সান্তালি, এই ভাষার প্রায় দশ রকম ভাষাবৈচিত্র্যও দেখা যায়। সাঁওতালি ভাষার প্রধান কেন্দ্রস্থল সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের পর এর প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায়। নরওয়ের মিশনারি পি.ও. বোর্ডিং-এর চেষ্টায় সাঁওতালি লোককথা ও পুরাণ সংকলিত হয়েছে। সাঁওতালি ভাষা লেখা হত বাংলা অথবা রোমক লিপিতে। বর্তমানে সাঁওতালি লিপি 'অলচিকি' গড়ে উঠেছে এবং এই লিপির উদ্ভাবক রঘুনাথ মুর্মু। মুন্ডারি ভাষাও মিশনারিদের উদ্যোগে ভাষাতাত্ত্বিক মর্যাদা লাভ করেছে। ফাদার হফম্যানের সম্পাদনায় ১৩ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে 'মুন্ডারি এনসাইক্লোপিডিয়া'।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই অস্ট্রিক ও আর্য ভাষার পারস্পরিক যোগাযোগের কারণে বেশ কিছু মুন্ডা শব্দ সংস্কৃত ভাষায় এসে যায়। পরবর্তীকালে এরকম কিছু শব্দ বাংলায়ও এসেছে। যেমন—কদলী, অলাবু, তাম্বুল ইত্যাদি। আবার 'দেশি' এবং 'অজ্ঞাতমূল' বলে চিহ্নিত বেশ কিছু শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষার মধ্যেও গৃহীত হয়েছে। খোকা, খড়, ডাঙা, চিংড়ি, তোতলা প্রভৃতি এর উদাহরণ; এমনকি 'রত্ন' শব্দের ক্ষেত্রেও মূলে মুন্ডা প্রভাব আছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের আরেকটি শাখা মোন্-খমের, যার মধ্যে ৭টি ভাষা অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খাসি ভাষা। উত্তর-পূর্ব ভারতে খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে এই ভাষাভাষী মানুষের বাস। খাসি আগে লেখা হত বাংলা হরফে, এখন লেখা হয় রোমক লিপিতে। ভারতে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ভোট-বর্মী ভাষাগুলির মধ্যে অস্ট্রো-এশিয়াটিক খাসি ভাষার অবস্থান নিঃসন্দেহে ভাষাবিজ্ঞানীদের কৌতুহল জাগায়। খাসি ভাষা ছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিকোবরি ভাষা মোন্-খমের শাখার অন্তর্ভুক্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

দ্রাবিড় ভাষাবংশ :

ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম হল দ্রাবিড় ভাষাবংশ। প্রত্ন-অস্ত্রালদের পর ভূমধ্যীয় জনগোষ্ঠী (Mediterranean) ভারতে প্রবেশ করে, যাদের ভাষার নাম দ্রাবিড়। বর্তমানে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে এঁদের একচ্ছত্র বিস্তার। কিন্তু প্রাক-আর্যযুগে এঁরা যে নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন, যার ধ্বংসাবশেষ হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো, তা ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেই। আর্যদের আগমনের ফলে উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এসে হাজির হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে বর্তমানে দ্রাবিড় ভাষাই প্রধান, এ পরিবারের কিছু গৌণ ভাষা পূর্ব ও মধ্যভারতে প্রচলিত।

দ্রাবড়ি ভাষাবংশের ভাষাগুলি যেভাবে বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে ভারতে রয়ে গেছে নীচের ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হল ঃ

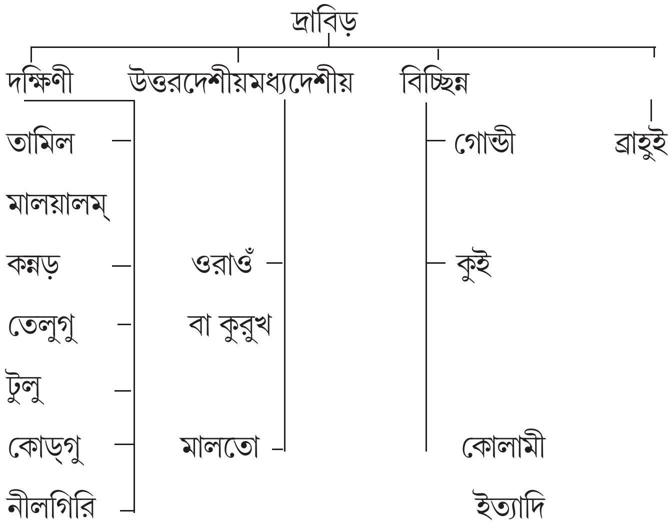

অনুমান করা হয় যে আর্যদের তাড়া খেয়ে দ্রাবিড়রা যখন দক্ষিণ দিকে চলে আসছিল, তখন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিম দিকে চলে যায়। বর্তমানে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে 'ব্রাহুই' ভাষার চিহ্ন মেলে। এ ভাষার চিহ্ন ধরেই এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে সিন্ধুসভ্যতা আসলে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাই।

একেবারে দক্ষিণে যে শাখাটি চলে এসেছিল, এমনকি হাজির হয়েছিল একেবারে সিংহলে, সেই দক্ষিণী শাখাটিই দ্রাবিড় ভাষাবংশের প্রধানতম শাখা। 'তামিল', 'তেলুগু' তামিলজাত 'মালয়ালম্', 'কন্নড়' দক্ষিণী শাখার উল্লেখযোগ্য ভাষার নিদর্শন। এছাড়াও নীলগিরির পার্বত্য অঞ্চলে 'টোডা' ও 'কোটা' অতি অল্পসংখ্যক আদিবাসীর ভাষা, 'টুলু' মহীশূর এবং 'কেড়্গু'ও মহীশূর ও মহীশূরের অন্তর্গত কুর্গ অঞ্চলের ভাষা।

'কুরখ' বা 'ওরাওঁ' এবং 'মালতো' বা 'মালপাহাড়ি' ভাষা উত্তরদেশীয় শাখার দুটি প্রধান ভাষা। বিহার-ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে ওরাওঁ ভাষা ব্যবহার করা হয়। বাংলা-ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত রাজমহল পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চলে মালতো বা মালপাহাড়ি ভাষা প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গেও ওরাওঁ ভাষায় কথা বলে এমন মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট।

মধ্যদেশীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষার সংখ্যা প্রায় সাতটি: গোণ্ডী, কোন্দ, কুই, খোন্দ, পরজি ইত্যাদি। গোণ্ডী ভাষা গোন্দ জনজাতির ভাষা হলেও মধ্যভারতের অনেকটা জুড়ে এর ব্যবহার এবং সর্বত্র অবিমিশ্রও থাকেনি। বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রে এ ভাষা প্রচলিত। কুই, কোন্দ, খোন্দ এ সবগুলি ভাষাই দেখা যায় ওড়িশায়। এছাড়া 'খোন্দ' অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এমনকি আসামে, 'পরজি' ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় প্রচলিত।

ভারতে দ্রাবিড় ভাষাবংশের অন্তর্গত এতগুলি ভাষার মধ্যে প্রধান ভাষা চারটি: তামিল, মালয়ালাম্, তেলুগু এবং কন্নড়।

তামিলনাড়ু, কেরালা ও মহীশূরের বেশ কিছু অংশে তামিল ভাষা প্রচলিত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৬ কোটি ৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮১৪ জন তামিল ভাষা বলেন, বর্তমানে তামিল প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত (ক) সাহিত্যিক তামিল ও (খ) কথ্য তামিল। কথ্য তামিলের অঞ্চল অনুযায়ী অনেকগুলি ভাষা-বৈচিত্র দেখা যায়, যেমন (১) কন্যাকুমারী অঞ্চলের তামিল (২) তিরুনেলভেলি ও রামনাদ জেলা (৩) মাদুরাই ও ত্রিচি (৪) কোয়েম্বাটুর জেলা (৫) তাঞ্জোর ও দক্ষিণ আরকোট জেলা (৬) চেন্নাই শহর ও চেঙ্গলপেট (৭) উত্তর আরকোট জেলা ইত্যাদি। 'তামিল ভাষার ক্ষেত্রে সামাজিক উপভাষার বিভেদও ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল উদ্রেক করে। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক অবয়ব-গঠনেও ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়।'* তামিলের নিজস্ব লিপিটি প্রাচীন ব্রাহ্মীর দক্ষিণদেশীয় বিভেদ 'গ্রন্থিলিপি' থেকে বিবর্তিত। তামিল ভাষায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা ১২টি (a, ā, i, ī u, ū, e, ē, o, ō, ai, au) এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ১৮টি। মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ নেই। তামিল লিপিতে যুক্তব্যঞ্জনের কোনো ব্যবহার নেই।

মালয়ালম্ ভাষা সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৯ম শতকে প্রাচীন তামিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ত্রয়োদশ শতকে এর স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটে। কেরল ও লাক্ষাদ্বীপের প্রধান ভাষা। শংকরাচার্য কেরলের অধিবাসী হওয়ায় দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে মালয়ালামেই সংস্কৃত প্রভাব বেশি। মালয়ালাম্ ভাষার ঐতিহাসিক পর্বে বিবর্তনের তিনটি সুস্পষ্ট রীতি চোখে পড়ে—১. সংস্কৃতানুগ ২, তামিল প্রভাবপুষ্ট ৩. তামিল প্রভাববর্জিত খাঁটি মালয়ালম্। মালয়ালমের লিপি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতোই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত এবং এই ভাষায় যাবতীয় সংস্কৃত বর্ণমালা প্রচলিত। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৯২ জন মালয়ালম্ ভাষায় কথা বলে।

কন্নড় ভাষা কর্ণাটক রাজ্যের প্রধান ভাষা হলেও কর্ণাটক রাজ্যের কাছাকাছি অন্যান্য রাজ্যের অংশগুলিতেও (যেমন মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং কেরল) প্রচলিত। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে ভারতে কন্নড় বলেন প্রায় ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ২৪ হাজার ১১ জন। কন্নড় ভাষা তামিল থেকে উদ্ভূত; প্রাচীনতম দ্রাবিড়ীয় শিলালিপি (৪০০ খ্রি,) কন্নড় ভাষাতেই লেখা হয়েছিল। সাহিত্যের ভাষা ও উচ্চবর্গের শিক্ষিতদের কন্নড় ভাষার সঙ্গে প্রচলিত কন্নড় ভাষার প্রভেদ বিরাট। কথ্যভাষার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের শ্রেণিগত ও আঞ্চলিক বিভেদ। অঞ্চলভেদে অনেকগুলি ভাষা-বৈচিত্র্য দেখা যায়, যেমন-মহীশূর, চিত্রদুর্গা, ধারওয়ার, উত্তর কানাড়া, দক্ষিণ

---

* পরেশচন্দ্র মজুমদার, আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে, দে'জ

কানাড়া, হাসান, বেল্লারি, গুলবর্গা ইত্যাদি। এর মধ্যে মহীশূর এবং ধারওয়ার অঞ্চলে যে ভাষার রূপটি প্রচলিত, পৃথকভাবে এ দুটি রূপই আদর্শ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। কন্নড় লিপি প্রতিবেশী তেলুগুর অনুরূপ। তামিল ভাষার সঙ্গে কন্নড়ের যোগ খুব বেশি হলেও লিপির ক্ষেত্রে যোগ তেলুগুর সঙ্গেই বেশি।

ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক থেকে ভাষাবংশের মধ্যে ভারতে প্রথম স্থান তেলুগু ভাষার। ২০০১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে ভারতে প্রায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ২ হাজার ৮৭৬ জন তেলুগু ভাষায় কথা বলে। তেলুগু ভাষার প্রচলনস্থান প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ। জাতিবাচক 'অন্ধ্র' শব্দটি ভাষা অর্থেও ব্যবহৃত হত। পরে ভাষার নাম দাঁড়াল 'তেলেঙ্গ' এবং এই 'তেলেঙ্গ' থেকেই 'তেলুগু' শব্দটি এসেছে। তেলুগু ভাষার বৈচিত্র্য আঞ্চলিক ভেদে চার রকমের—শ্রীকাকুলম ও বিশাখাপত্তনম জেলা (উত্তরদেশীয়); কৃষ্ণ, গুন্টুর ও গোদাবরী জেলা (মধ্যদেশীয়); তেলেঙ্গানা জেলাগুলি অর্থাৎ আদিলাবাদ, করিমনগর, ওয়ারাঙ্গল, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি (পশ্চিমা); কোরমু, অন্তপুরম্, নেলোর ইত্যাদি (দক্ষিণদেশীয়)। এর মধ্যে মধ্যদেশীয় বৈচিত্র্যটি আদর্শ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। তেলুগু লিপি কন্নড় লিপির সঙ্গে অভিন্ন। ব্রাহ্মী লিপির সন্ততি পল্লব লিপি থেকে খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দে তেলুগু লিপি বিশিষ্টতা অর্জন করে।

বৈদিক যুগ থেকেই দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ শুরু হয়েছিল বলে ভাষার দিক থেকে পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপ অনেকটাই চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের বেশ কিছু শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে, যেমন ময়ূর, খাল, বিল ইত্যাদি; সংস্কৃত ভাষাতেও অণু, গণ, পুষ্প, পূজা, তন্ডুল প্রভৃতি শব্দ এসেছে এবং সেগুলি বর্তমানে তৎসম শব্দ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত। বাংলায় পিলে, উলু, খাল, গুঁড়ি, জেলা প্রভৃতি শব্দ দ্রাবিড়জাত। ভারতীয় ধ্বনিমালায় মূর্ধণ্যধ্বনি প্রবর্তনের মূলেও যে দ্রাবিড় ভাষা, তা অনেক ভাষাতাত্ত্বিকই মনে করেন কারণ সুইডিশ ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধণ্যধ্বনি নেই।

ভোটচিনা ভাষাবংশ :

নৃতাত্ত্বিকরা অনেকাংশেই নিশ্চিত যে ভারতে আর্য আগমনের আগেই মঙ্গোলয়েডরা ভারতে প্রবেশ করেন। মঙ্গোলয়েডরা যে ভাষায় কথা বলতেন তাঁদের সেই ভাষাকে ভোটচিনা বলা হয়। এই ভোটচিনার প্রধান দুটি শাখা—(১) তাইচিনা ও (২) ভোটধর্মী। আরও একটি শাখার কথা পাওয়া যায়, যার নাম য়েনিসি (yenissi)। এর সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই। ভোটধর্মী শাখা ভারতবর্ষের হিমালয় অঞ্চলে প্রচলিত। ভোটধর্মী শাখার অন্তর্গত ভোটিয়া ভাষার কেন্দ্র লাসা হলেও এই ভাষার নানান বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় কাশ্মীরের লাদাখ, হিমাচলপ্রদেশের লাউল ও স্পিতি জেলায়। পূর্ব হিমালয়ের সিকিম ভোটিয়ারা, ভূটানিরা, শেরপা ও কাগ্‌তেরা যে ভাষায় কথা বলে সেগুলি সবই এই ভাষাবংশের অন্তর্গত।

ভোটধর্মী শাখাভুক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বা 'নেফামণ্ডলে বা অরুণাচল প্রদেশ এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ২৪টিরও বেশি ভাষা পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রধান হল আকা, আবর, দফলা, মিসমি এবং মিরি।

আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর এইসব অঞ্চলে যে ভাষাগুলি দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রধানত চারটি ভাগ—

১. বোরো বা বোডো :— এই শ্রেণিভুক্ত প্রায় ২২টি ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাছারি, রাভা, কোচ, গারো ও মেচদের ভাষা, ত্রিপুরা রাজ্যের টিপ্রা ইত্যাদি।

২. নাগা :— প্রধানত নাগাল্যান্ড ও মণিপুর, কিছুটা অরুণাচল প্রদেশ ও আসামে এই শাখার ভাষাগুলি ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে প্রধান হল—আও, অঙ্গামি, সেমা, তঙ্গখুল, লোথা ইত্যাদি।

৩. কুকিচিন :— আসামের লুসাই পার্বত্য অঞ্চল, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই শাখার যে ভাষাগুলি প্রচলিত তার মধ্যে প্রধান ঐতিহ্যবাহী মণিপুরের মেইতেই ভাষা। এছাড়াও, লুসাই বা মিজো এবং কুকি ভাষাও উল্লেখযোগ্য।

৪. বর্মি :— যদিও বর্মি ব্রহ্মদেশের ভাষা তবে, চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলের মোঘ ও ম্রু এই শাখার অন্তর্গত।

তাইচিনা বর্গের শ্যামীয় শাখার মধ্যে খামতি উত্তর-পূর্ব আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের প্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচলিত। খ্রিস্টীয় ১৩০০ থেকে ১৮০০ শতক পর্যন্ত আহোম ভাষা আসামে প্রচলিত ছিল (আহোম থেকেই আসাম শব্দের উৎপত্তি)।

ভারতীয় আর্য ভাষাবংশ ও বাংলা ভাষার উদ্ভব :

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে যতটা দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে, ভোটচিনা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের মিশ্রণ অতি অল্প। ভাষাতাত্ত্বিকেরা যে কয়েকটি শব্দে এই মিশ্রণের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল কীচক, তসর, তোয়া, সিন্দুর, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় এই ভাষাবংশ থেকে বেশ কিছু শব্দ চলে এসেছে। যেমন, বর্মী ভাষা থেকে লুঙ্গি, চিনা ভাষা থেকে চা, লিচু প্রভৃতি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর যে শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে সেই শাখার নাম ভারতীয়-আর্য। খ্রিস্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই শাখার অনুপ্রবেশ এবং তারপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বছরেরও বেশি সময় জুড়ে এই ভারতীয় আর্য ভাষা নানা রূপে ভারতের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে।

এই সাড়ে তিন হাজার বছরের ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo Aryan, OIA), মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo Aryan, MIA) এবং নব্য ভারতীয় আর্য বা (New Indo Aryan, NIA)। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নমুনা ঋক্‌বেদ। ঋক্‌বেদ পরবর্তী তিনটি বেদও এই প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষারই নিদর্শন বলে সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অনেক সময় বৈদিক ভাষা বলেও অভিহিত করা হয়। যদিও, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে আছে দুটি পর্যায়— (১) বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য এবং (২) সংস্কৃত। সুতরাং এ কথা মনে রাখা উচিত যে বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয়। সংস্কৃতকে বলা যেতে পারে বৈদিক ভাষারই বিবর্তিত ও ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। আসলে যে-কোনো ভাষারই থাকে যেমন একদিকে লেখা ভাষা, অন্যদিকে থাকে আঞ্চলিক কথ্য বা লৌকিক ভাষা। এক্ষেত্রে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার কিছু আঞ্চলিক ও লৌকিক রূপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছিল। যখন লৌকিক ভাষার মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে সৃষ্টি হল ব্যাকরণে ও প্রয়োগে বিশৃঙ্খলা, তখন তাকে নিয়মবন্ধ করে শিষ্ট লেখ্য ভাষায় পরিণত করেছিলেন পাণিনি। পাণিনি পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ। কারণ, যেভাবে তিনি একটি বহু শাখায়িত ও জটিল ভাষাকে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং পরিণত করেছেন শিষ্ট ভাষায় তা

এককথায় অতুলনীয়। এই পুরো কাজটি তিনি আটটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা ও বিবৃত করেছিলেন বলে তাঁর ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'।

অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিশাখদত্ত, শূদ্রক প্রমুখ কবি ও নাট্যকারদের রচনায় এই ভাষার নিদর্শন আছে। সংস্কৃত ছিল প্রধানত শিক্ষিত লোকের ভাব বিনিময়ের ভাষা বা সাহিত্যের ভাষা। ক্রমেই বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা থেকে দূরে সরে সাহিত্যের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করলেও সাধারণ মানুষের মুখে সংস্কৃতের আর-একটি রূপ সমান্তরাল গতিতে তৈরি হচ্ছিল। যে ভাষা বৈদিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষা নয়, অথবা ব্যাকরণের কঠিন নিয়মকে মান্যতা দিয়ে সে ভাষা চলছিল না। বরং; তদানীন্তন সমাজের দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর সংযোগের ফলে এই ভাষার নমনীয়তা গিয়েছিল বেড়ে। এর নাম আমরা দিতে পারি লৌকিক বা কথ্য সংস্কৃত এবং ধীরে ধীরে এভাবেই কথ্য সংস্কৃতের ক্রমবিবর্তনের ফলেই সাধারণের মুখের ভাষা হয়ে দাঁড়ায় প্রাকৃত ভাষা।

এই প্রাকৃত শব্দটির উদ্ভবের মধ্যে দুটি দিক আছে। একটি হল প্রাকৃত শব্দটি 'প্রকৃতি' থেকে জাত। প্রকৃতি শব্দের অর্থ হল মূল উপাদান। অর্থাৎ, এই যে প্রাকৃত ভাষা তার মূল উপাদান বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। এই যে প্রাকৃত ভাষা তার মূল উপাদান বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে যেহেতু এই নতুন ভাষাটি এল তাই তার নাম হল প্রাকৃত। আবার অন্য অর্থে যেহেতু শিক্ষিত লোকের থেকে সরে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভাষারূপে এর উদ্ভব, তাই জনগণের ব্যবহৃত ভাষা বা প্রাকৃত জনের ভাষা বলে এর নাম প্রাকৃত ভাষা। সময়ের দিক থেকে ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পর্বের প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা, আর এই পর্বটির নাম মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাকে যেমন 'সংস্কৃত' আখ্যা দিলে ভুল হয়, তেমনি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাকে শুধু 'প্রাকৃত' বললেও সেই একই ভুল হয়। যাই হোক মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের শিলালিপি। এছাড়াও এ পর্বে হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত সংস্কৃত এবং পালি ভাষা দেখা দিল। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অবলম্বনে শিলালিপিগুলি লেখা হয়েছিল বলে একদিকে প্রাকৃত যেমন ছিল জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত মুখের ভাষা, অন্যদিকে ধর্মসাহিত্যের ভাষা হিসেবে ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম স্তরের একটি ভাষারূপ হল পালি। হীনযানী বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের বাণী যে ভাষায় প্রচার করেছিলেন তা-ই পালি ভাষা। পালি কোনো বিশেষ অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল না। মার্জিত সাহিত্যিক ভাষা হিসেবেই পালির উদ্ভব। কিন্তু কোনও প্রাকৃত ভাষার আধারে পালি ভাষা গড়ে উঠেছিল, তা বিতর্কিত একটি বিষয়। বুদ্ধদেব যেহেতু মগধের লোক ছিলেন, সুতরাং অনেকে আন্দাজ করেছেন যে মাগধী প্রাকৃত থেকেই পালির জন্ম। আবার অনেকে অর্ধমাগধী থেকে, 'গিরনার প্রশস্তি'র ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যহেতু উজ্জয়িনীর ভাষারূপে, দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনে পালির উৎপত্তি বলে মনে করেন। সুকুমার সেন মনে করেন যে 'পালি' নামটি সিংহলি বৌদ্ধ পণ্ডিত বুদ্ধঘোষের দেওয়া। বুদ্ধদেব যে ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করেন সেই ভাষাটিকেই বলা যেতে পারে পালির প্রাথমিক রূপ। পালি ভাষা হল সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাঝামাঝি একটি স্তর।

পালি ভাষায় রচিত নিদর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি, বিশেষত 'ত্রিপিটক' এবং বুদ্ধের জীবনকাহিনি নিয়ে লেখা 'জাতকের গল্প' উল্লেখযোগ্য। 'সুত্তনিপাত' ও 'থেরগাথা' পালিভাষায় লেখা উৎকৃষ্ট কবিতা সংকলন।

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার ব্যাপ্তি প্রায় দেড় হাজার বছর এবং এই দীর্ঘ সময়কাল জুড়ে স্বাভাবিক নিয়মে এই পর্বের আর্য ভাষার নানা স্থানিক বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে। যেমন ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত এবং অর্ধমাগধী প্রাকৃত—এই আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত আদর্শ প্রাকৃত হিসেবে নাটকে বা কাব্য কবিতায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য রচনার নিদর্শন হিসেবে হালের গাহাসত্তসঈ, প্রবরসেনের সেতুবন্ধ, বাকপতি রাজের গউড়বহো-র কথা বলতে পারি। এই সাহিত্যিক প্রাকৃতগুলির মধ্যে শৌরসেনী সবচেয়ে প্রাচীনতাধর্মী, পশ্চিম ভারতের মথুরা, দিল্লি, মিরাট অঞ্চলে এর প্রচলন ছিল। সংস্কৃত নাটকে শিক্ষিত রমণী, রাজপুরুষের সংলাপে শৌরসেনী প্রাকৃত ব্যবহৃত হত। পৈশাচী প্রাকৃতের উৎস সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম ভারত হলেও পরবর্তীকালে মধ্যভারতেও এর প্রচলন হয়। পৈশাচী প্রাকৃতের সাহিত্যিক নিদর্শন খুব বেশি নেই। মাগধী প্রাকৃতের নামের মধ্যে মগধের উল্লেখ থাকায় মনে হয় এ ভাষা পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল। এর প্রাচীনতম নিদর্শন আছে সুতনুক প্রত্নলিপিতে। অর্ধমাগধীর ব্যবহার জৈন ধর্মসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে অনেকে 'জৈন প্রাকৃত' বলেন এবং এই কারণে এর কোনো ভৌগোলিক সীমারেখাও ছিল না। কিন্তু তবু এর উৎস হিসেবে লখনউ, অবধ এই অঞ্চলকে মনে করা হয়।

এর পরবর্তীকালের স্তরকে অপভ্রংশের স্তর বলা হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সবকটি প্রাকৃতেরই পরবর্তী পরিণতি হল অপভ্রংশ; অর্থাৎ শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ ইত্যাদি। আবার অপভ্রংশের পরবর্তী স্তরের নাম অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ। যদিও অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এই অবহট্‌ঠকে আলাদা করতে চাননি। অবহট্‌ঠকে অপভ্রংশেরই অন্তর্গত করে দেখতে চেয়েছেন। তবে এই পর্যায়ে এসেই শেষ হল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কাল।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তার ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বলতে কোনো একটা ভাষা বোঝায় না। বরং মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার শেষতম স্তরে যে নানান আঞ্চলিক রূপ ফুটে উঠেছিল, নবম শতকে সেখান থেকেই ক্রমে জন্ম নিল আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি। পৈশাচী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিল সিন্ধি, পশ্চিমা ও পূর্বী পাঞ্জাবি। সিন্ধি ভাষা ভারতে কচ্ছ অঞ্চলে প্রচলিত, লিপি কোথাও আরবি-ফারসি, কোথাও লণ্ডা। পূর্বী পাঞ্জাবি পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লি অঞ্চলে প্রচলিত। শিখদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহিব' এই পূর্বী পাঞ্জাবি ভাষায় গুরমুখী লিপিতে লেখা। পশ্চিমা পাঞ্জাবি পশ্চিম পাঞ্জাবের ভাষা, এর আরেক নাম লহন্দী। মহারাষ্ট্রী, প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে এসেছে মারাঠী ও কোঙ্কনী। মারাঠী প্রচলিত মহারাষ্ট্রে, কোঙ্কনী গোয়ায়। মারাঠী আর কোঙ্কনী দক্ষিণ ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আর্য ভাষা।

শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে নেপালি, কুমায়নি আর গাড়োয়ালী। হিমালয়ের কোলে পাহাড়ি গ্রামগুলোয় এই ভাষাগুলি প্রচলিত। মধ্য ভারতের কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী ও বন্দারু এই পাঁচ ভাষারও উদ্ভব শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে। ব্রজভাষা মথুরা, আলিগড়, আগ্রা অঞ্চলে, কনৌজী মথুরার পূর্বদিকে দোয়াব অঞ্চলে, বুন্দেলী মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড ও বন্দারু হরিয়ানার ভাষা। এই

পাঁচটি ভাষাকে একসঙ্গে পশ্চিমা হিন্দি বলা হয়। যে হিন্দি আজ রাষ্ট্রভাষা বলে গৃহীত হয়েছে, সেটি এই পশ্চিমা হিন্দির অন্তর্গত একটি কথ্য হিন্দুস্থানীর মার্জিত আর্দশায়িত রূপ। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান কবিরা আরবি-ফারসি শব্দবহুল এক নবরূপায়িত হিন্দি ভাষার চর্চা করেছিলেন, সেটিই পরে উর্দু ভাষারূপে স্বীকৃত হয়। এসব ছাড়াও গুজরাতি ও রাজস্থানি ভাষা দুটিও এসেছে শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে।

অর্ধমাগধী প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে তিনটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার আবির্ভাব ঘটে। অবধী, বাঘেলী ও ছত্তিশগড়ী। এই তিনটিকে একত্রে পূর্বী হিন্দিও বলা হয়।

মাগধী প্রাকৃত-অপভ্রংশ আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের মাতৃভাষা ও প্রতিবেশী ভাষাগুলি এসেছে এখান থেকেই। মাগধী ভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত—পূর্বী ও পশ্চিমা। পশ্চিমা শাখা থেকে এসেছে বেনারস, রোহতাস, সাসারাম প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা, ভোজপুরি, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, হাজারিবাগের ভাষা মগহী এবং ভাগলপুর-মজফ্‌ফরপুর অঞ্চলের মৈথিলি ভাষা। আর পূর্বী শাখা থেকে এসেছে আসাম আর ওড়িশার অহমিয়া ও ওড়িয়া ভাষা এবং অবশ্যই বাংলা ভাষা যা পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খণ্ড-বিহার-আসামের কিছু অংশে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রচলিত। আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দকে যদি বাংলা ভাষার জন্মসাল ধরি, তাহলে আজ বাংলাভাষার বয়স হাজার বছরের কিছু বেশি।

সাধারণভাবে চর্যাপদের ভাষাকেই ধরা হয় বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে অষ্টম শতকের আগে বৌদ্ধ বজ্রযানী ও নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যরা যে কড়চা ও ছড়াজাতীয় রচনা লিখেছিলেন, তাতে বাংলা ভাষার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। চর্যাপদের ভাষাই যে প্রাচীন বাংলাভাষার রূপ সেকথা প্রতিষ্ঠা করতে ভাষাতাত্ত্বিক লড়াই বাঁধে। কারণ চর্যার ভাষার উপর দাবি ছিল অনেকগুলি ভাষার, যেমন মৈথিলি, ওড়িয়া, হিন্দি বা অসমিয়ার। এই দাবি যে গ্রহণীয় নয় তা নিয়ে সংশয় না থাকলেও এই ভাষাগুলির প্রাচীন রূপের সঙ্গেও মিল ছিল প্রচুর, কারণ এই ভাষাগুলো বাংলারই সগোত্র, উৎসগতভাবে এক।

বাংলাভাষার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ সময়ে তার যে বিবর্তনপথ তাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা **কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন :**

১ম পর্যায় : প্রাচীন বাংলা (আধুনিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)

২য় পর্যায় : মধ্য বাংলা

আদি-মধ্য বাংলা (আনুমানিক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

অন্ত্য-মধ্য বাংলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

৩য় পর্যায় : আধুনিক বাংলা (আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত)

প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন যে চর্যাপদ তা আগেই বলেছি। এছাড়াও 'অমরকোষের' সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চারশোর বেশি প্রতিশব্দে, ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল' বইয়ে কয়েকটি কবিতায় এবং 'সেক-শুভোদয়া'য় উদ্ধৃত গানে ও ছড়ায় প্রাচীন বাংলার চিহ্ন রক্ষিত আছে।

আদি-মধ্য বাংলার নিদর্শন হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে ধরা হয়। আদি-মধ্য বাংলার বিস্তৃতিকাল যেহেতু ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তাই এই দেড়শো বছর ব্যাপী সময়ের একটিমাত্র নিদর্শন ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে এক অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। এই অস্বস্তির কারণ এই যে, ধরে নিতে হবে, এই দীর্ঘ সময়ে

আর কোনো সাহিত্যিক রচনা সম্ভব হয়নি। এই সময়কে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলে অভিহিত করার মধ্যে অতিসরলীকরণের একটা প্রবণতা আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্যকে এর কাছাকাছি সময়ের রচনা বলে ধরা হলেও এগুলির ভাষা পরবর্তীকালে এত বেশি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে এগুলিকে আর প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে হাজির করা যায় না।

চর্যাপদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার অনেকটাই ফারাক চোখে পড়ে। এমনকি, চর্যার ভাষাকে আমাদের আধুনিক বাংলাভাষার তুলনায় যতটা দূরের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা কিন্তু ততটা অপরিচয়ের দূরত্বে অনাত্মীয়ের মতো নয়।

যেমন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে।

আধুনিক বাংলা রূপান্তর—

বড়াই, কালিন্দী নদীর কূলে কে সে বাঁশি বাজায়,

বড়াই, গোষ্ঠ-গোকুলে কে সে বাঁশি বাজায়।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই আড়াইশো বছরের বাংলা ভাষার ধরনটিকে আমরা অন্ত্য-মধ্য বাংলা বলতে পারি। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন প্রচুর। বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্যজীবনী, মঙ্গলকাব্যসমূহ, আরাকান রাজসভাশ্রিত সাহিত্য, গীতিকা, নাথসাহিত্য—প্রভৃতি পর্যাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শন এ সময়ে পাওয়া যায়। এ সময়ের বাংলা যেন অনেকটাই আমাদের বাংলার মতো। সে কারণেই এসব সাহিত্যের নানান পংক্তি আমাদের ভাষাতেও ব্যবহৃত হয় প্রবাদ-প্রবচনরূপে, যেমন—‘শিশু কান্দে ওদনের তরে’, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’, ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়’ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার আধুনিক কাল বলতে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত সময়কে ধরা হয়। অন্ত্য-মধ্য স্তরের ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড়ো ফারাক সৃষ্টি হয়েছে গদ্যরীতির ব্যবহারে। অন্ত্য-মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল না এমন নয়, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতিতেই গদ্যের প্রয়োগ সীমিত ছিল। আধুনিক যুগেই প্রতিষ্ঠিত হল সাহিত্যিক গদ্য। আবার, এ ঘটনার পাশাপাশি আধুনিক বাংলাতেই মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। লেখার ভাষার সাহিত্যিক রূপটি ‘সাধুভাষা’ নামে পরিচিত হয়। অন্যদিকে, স্বরসংগতির প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দেওয়ায় তা মুখের ভাষা এবং চলিতভাষায় স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

এই বিবর্তনপথেই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যগুলি। এর ফলে একই ভাষার নানান রূপ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এইভাবেই ভাষা বহতা নদীর মতো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ বদল করতে করতে এগিয়ে চলে। আজকের ভাষাও পালটে যাবে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তখন শুরু হবে বাংলা ভাষার আরেক অধ্যায়।

সংস্কৃত ভাষাকে অনেকেই মনে করেন বাংলা ভাষার জননী। কিন্তু এ মত কি গ্রহণযোগ্য? এ মত কি সরলীকরণের ঝোঁকে উঠে আসা? এ মত কি নিজেদের ‘আর্য’ ভাবার মতো উন্নাসিক মানসিকতার ফসল? এই প্রশ্নগুলি জড়িয়ে আছে সংস্কৃত ও বাংলার সম্পর্কের মধ্যে।

উনিশ শতকের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যাঁরা বাংলা ভাষাচর্চা করতেন, তাঁরা মনে করেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব। এই ধারণা অনুযায়ী সে-সময়ে যতগুলি বাংলা ব্যাকরণ বই লেখা হয়েছিল সেগুলি আসলে সংস্কৃত ব্যাকরণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' বাংলা ভাষা আসলে সংস্কৃত ভাষারই সন্তান—সন্দেহ নেই, এ মানসিকতাই কাজ করেছে এক্ষেত্রে। এঁরা মনে করেন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার শেষপর্বের ভাষা সংস্কৃত, তাই সংস্কৃত ভাষার বিবর্তনসূত্রে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা অর্থাৎ প্রাকৃত-অপভ্রংশ এবং সেখান থেকেই নব্যভারতীয় আর্য ভাষারূপে বাংলা ভাষার জন্ম। এই মতকে আরও জোরদার করেছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণে ও শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃতের গভীর প্রভাব।

কিন্তু সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দুটি দিক থেকে বলা যায় যে সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননীস্বরূপা নয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন মার্জিত সাহিত্যিক রূপ বৈদিক সাহিত্য এবং অর্বাচীন মার্জিত সাহিত্যিক রূপ ধ্রুপদী সংস্কৃত। এই ধ্রুপদী বা লৌকিক সংস্কৃত বিবর্তিত হয়নি, এর কথ্যরূপটি থেকেই এসেছে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত বৈদিক ভাষা তিনটি ধারায় বিবর্তিত হয়—সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি। এই প্রাকৃত থেকেই দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। আসলে প্রাকৃত ছাড়া সংস্কৃত ও পালি দুটিই সাহিত্যিক ভাষা, ফলে এই দুই ভাষার বিবর্তনের সম্ভাবনাও কম।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে-ভাবে এই বিষয়টি দেখিয়েছেন তা হল—

সুতরাং, প্রাচীন ভারতীয় আর্য থেকে মধ্য ভারতীয় আর্যের মাগধী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ,

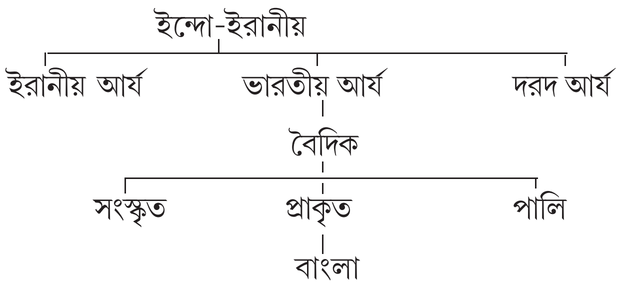

মাগধী অপভ্রংশ থেকে অবহট্‌ঠ এবং তা থেকে বাংলার জন্ম। এখন এই পরম্পরায় মাগধী অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের কোনো নিদর্শন পাওয়া না গেলেও এবং অনুমিত হলেও এই স্তরপরম্পরা যুক্তিগ্রাহ্য। সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন অনুসরণে বলা যায় মাগধী অপভ্রংশ বাংলা ভাষার জননী। সংস্কৃতর সঙ্গে বাংলার যোগ বহুদূরবর্তী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় সংস্কৃত বাংলা ভাষার 'অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ পিতামহী।'

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা ভাষার কুলজী' এবং 'দ্রাবিড়' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সঙ্গে একমাত্র আর্য ভাষারই সম্পর্ক আছে এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অনার্য ভাষাগুলি অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং ভোট-চিনীয় ভাষাগুলি আর্যবসতি স্থাপনের আগে প্রচলিত ছিল। ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময় এইসব ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষার উপাদান বহুল পরিমাণে মিশে গেছে আর্য ভাষার বিবর্তিত রূপের সঙ্গে। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি বাংলা শব্দভাণ্ডারে আছে অজস্র অনার্য শব্দ, যাকে আমরা দেশি শব্দ বলে থাকি। এই কারণেই সুনীতিকুমার বলেছেন, বাংলা ভাষা 'অনার্য্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আর্য্য ভাষা'।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন লিপি এবং বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ

লিপির ইতিবৃত্ত :

মানুষের সবথেকে বড়ো আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি হল ভাষা আবিষ্কার। কিন্তু ভাষা তো মূলত কথ্য ও শ্রাব্য। যে মুহূর্তে কোনো কথা বলা ও শোনা হল তার পরে কখনো সেই কথাটি অবিকৃতভাবে পাওয়া ছিল অসম্ভব। এই সংরক্ষণ তথা স্থানান্তর ও কালান্তরের বাসনা থেকেই মানুষকে তৈরি করতে হল লিপি। অর্থাৎ, যে ভাষা ছিল বলা আর শোনার বিষয়, দৃশ্যরূপ দিয়ে লিপি তাকে করে তুললো লেখা আর পড়ার সামগ্রী। এই অর্থে লিপি মাত্রেই ছবি, আর এই ছবির চিত্রণের পশ্চাতে কাজ করেছে প্রতীকীয়তা আর বিমূর্ততার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের আবিষ্কৃত লিপিপদ্ধতি তাই ক্রমশই এক-একটি বস্তু বা বিষয়ের প্রতীক না থেকে বিভিন্ন বিমূর্ত মনোভাব অথবা অক্ষরসমূহ এবং শেষপর্যন্ত কেবলমাত্র বিভিন্ন ধ্বনির প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সাধারণভাবে লিপির উদ্ভব ও বিকাশ এবং বিশেষত বাংলা লিপির উৎস ও বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বলগা হরিণ শিকার– স্পেনের কুইভা দেল মা দঁ গুহার প্রস্তরযুগের একটি গুহাচিত্র

লিপির খোঁজ মানুষ প্রথমে কিন্তু পায়নি। প্রথমে সে মনের ভাব প্রকাশ করতো ছবি এঁকে। ফ্রান্স, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, সাইবেরিয়া, এমনকি ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকাতেও পাওয়া গেছে অজস্র গুহাচিত্র। আদিম মানুষের শিকার কাহিনি আঁকা আছে এইসব ছবিতে। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো গুহাচিত্রটি তিরিশ হাজার বছরেরও বেশি আগে আঁকা হয়েছিল। ছবি এঁকে মানুষ মনের অন্যান্য ভাবও আদান প্রদান করত। কিন্তু সব কথা তো ছবি এঁকে বোঝানো যায় না। ছবি আঁকা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর ছবি সবাই আঁকতেও পারে না। তাই ক্রমশই ছবি ভেঙে ছবির আদলে অক্ষর লেখার দিকে এগোতে চেষ্টা করলো মানুষ। ছবি-ভাঙা এই লিখনকেই বলা হয় 'চিত্রলিপি'। কিন্তু এরও আগে লিপির আর একটি স্তর রয়েছে, তাকে লিপিবিশারদ ডেভিড ডিরিঞ্জার নাম দিয়েছেন ভ্রূণলিপি।

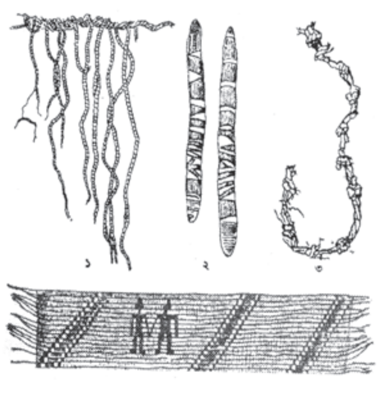

৪

প্রথম পর্যায়ে পাই ছবি। যেমন জাদুবিশ্বাস উদ্ভূত পটশিল্প, প্রায় ২০ হাজার বছর আগে এইভাবে লিপির পূর্বসুরী এই পটের আবির্ভাব হচ্ছে যার ছবি বিশেষ বিশেষ বার্তাবহ। অথবা বিভিন্ন পাথরের নুড়ির বিন্যাসেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাতো, নুড়ির বর্ণ এবং উপরে লোহার কাজ, সমস্তের বিন্যাসের উপর অর্থ নির্ভর করতো। দড়িতে গিঁট এইরকমই আর একটি পদ্ধতি যা কিনা স্মৃতি সহায়ক হিসেবে এখনো প্রচলিত। বিভিন্ন গিঁট বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিবাহী, একে Quipu বলে। পেরুর 'কিপু'-র(১) মতোই উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া আদিবাসীরা পুঁতি গেঁথে তৈরি করে কোমরবন্ধ বা 'ওয়ামপুম'। পুঁতির বিন্যাস ও সজ্জা

দেখে বুঝতে হয় প্রস্তুতকারক কী বলতে চান। এছাড়া লাঠির গায়ে দাগ কেটে, গাছের ডালে ন্যাকড়া জড়িয়েও নানা খবর চালাচালি হতো। লাঠির গায়ে কাটা দাগের মাপ ও দূরত্ব(২), ন্যাকড়া বাঁধার ধরন(৩) প্রভৃতি থেকে বুঝতে হতো বক্তব্য বিষয়। সংকেত বা বার্তা প্রেরণের মধ্য দিয়েও মানুষের আদান প্রদানের কাজে প্রতীকী হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখবো। পান দেওয়া মানে আপ্যায়িত করা, কথা শেষ হওয়ার পর পান দেওয়ার অর্থ 'এবার তবে আসুন' অথবা কচুপাতায় রক্ত ও পশুপাখির পাকস্থলি পাঠানো মানে 'যুদ্ধং দেহি'—এরকম প্রবণতাই সূচিত করে।

কিন্তু এইসব সংকেত তো সকলে বুঝবে না। তাছাড়া সভ্যতা যতো এগোতে লাগল, মানুষের জ্ঞানবিশ্বের পরিধিও ততই বিস্তৃত হতে লাগল। কাজেই সংকেতের জগৎ থেকে বেরিয়ে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা খুবই জরুরি হয়ে উঠলো। এই সূত্রেই ছবি বা সংকেত ছেড়ে মানুষ ধরল ছবির আদল, যেমন গোরু বোঝাতে একটা গোটা গোরুর ছবি না এঁকে শুধু দুটো শিং আঁকা শুরু হল। পাতা এঁকে গাছ, বাটি এঁকে খাদ্য বা খাওয়া, পা এঁকে যাওয়া প্রভৃতি বোঝানো শুরু হল। এইভাবেই বর্ণ বা অক্ষর গড়ার পথে মানুষ তার প্রথম বড়ো পদক্ষেপ রাখল।

এর পরবর্তী যে লিপির ব্যবহার পাওয়া যায় তা প্রকৃত লিখন পদ্ধতি। তারই বিকাশ ক্রমশ উন্নততর চিত্রলিপি থেকে ভাবলিপি থেকে অক্ষরলিপি হয়ে অবশেষে ধ্বনিলিপিতে। লেখা বা লিপির আদি ব্যাপার তাই ছবি আঁকা। সাড়ে চার বা পাঁচ হাজার বছর আগেই প্রথম লিপির ব্যবহার শুরু হয়। পৃথিবীর সাতটি অঞ্চলে প্রথম প্রকৃত লিপির ব্যবহার শুরু হয়।

সুমেরু অঞ্চল—৪০০০ খ্রি. পূ.
ইজিপ্ট—৪০০০ খ্রি. পূ.
এজিয়ানা (হিট্ট + ক্রিট)—২০০০ খ্রি. পূ.
চিন—২০০০ খ্রি. পূ.
এলম—৩০০০ খ্রি. পূ.
সিন্ধু—৩০০০ খ্রি. পূ.
মায়া—১০০০ খ্রি. পূ.

Johannes Friedrich ১৯৬৬ তে প্রকাশিত তাঁর বইয়ে এই সাতটি অঞ্চলের কথা বলেন। বলা বাহুল্য, প্রথম যে প্রকৃত লিপির ব্যবহার, তা চিত্রলিপি। ক্রমে একটিমাত্র বস্তুকে না বুঝিয়ে তা বোঝাতে লাগল একটি ভাবকে। এই পর্যায়ের নাম 'ভাবলিপি'। চিত্রলিপি বা ভাবলিপি-র ক্ষেত্রে চিত্র বা চিহ্নটির সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক অর্থের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এরও পরে মানুষ আরো প্রতীকী হয়ে ওঠার চেষ্টা করল। চিহ্নগুলিও কেবল কোনো বস্তু বিষয় বা ভাবকে না বুঝিয়ে হয়ে উঠল এক একটি অক্ষর বা Syllable-এর প্রতীক। একে 'অক্ষরলিপি' বলা হয়। এরও পরের স্তরে চিহ্নগুলি হয়ে উঠল কেবলমাত্র এক একটি ধ্বনির প্রতীক। এই 'ধ্বনিলিপি'-ই সবথেকে আধুনিক। ধ্বনিলিপি হল উচ্চারণভিত্তিক লিপি, যেমন 'কলম' উচ্চারণ করতে গেলে প্রথম ধ্বনিটি হবে 'ক'। এই ধ্বনিটির চিহ্ন যে বর্ণটি (ক) 'কমল' বা 'কলা' বললেও সেই বর্ণটিই লেখার সময় ব্যবহৃত হবে। অর্থ পরিবর্তনের

ছবি থেকে চিত্রলিপি

* 'Kurzgefasstes Hethitisches Wörterbuch'

সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিবর্তন করার আর দরকার নেই। 'খেলা' বা 'খুশি' বা 'খোসামোদ' লিখতে গেলে 'খ' দিয়ে শুরু করতে হবে। অবশ্য স্বরভেদে 'খ'-এর সঙ্গে এ-কার, উ-কার বা ও-কার যুক্ত হবে মাত্র। অর্থাৎ উচ্চারণকে অনুসরণ করেই অক্ষর বদলে বদলে যায়। এইভাবেই যে লিপি ছিল কেবলমাত্র বিশেষ কোনো বস্তু, বিষয় বা ভাবের প্রতীক তা হয়ে উঠলো কোনো ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধ্বনির প্রতীক। ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ নয়, ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের দিকটিই এইভাবে হয়ে উঠল প্রধান। যেমন গোরুর মুখের ছবি থেকে এসেছে 'α' বর্ণটি। এই গ্রিক 'α' (আলফা) থেকে এসেছে ইংরাজি 'a' বর্ণটি। আজ তোমরা যখন এই অক্ষরটি ব্যবহার করে 'april' বা 'apple' লেখো, নিশ্চই গোরুর কথা তোমাদের মাথাতেও আসে না। অথচ এক সময় 'α' বর্ণটি কেবল গোরুকেই বোঝানো, ভাবা যায়!

১৯৮৩ তে Mary Rosamond Hass দুটি পদ্ধতির কথা বললেন, যা লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হল। তাঁর Determining the Level of a Script' প্রবন্ধে লিখনের দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে—Plenemic এবং Cenemic, পৃথিবীর যাবতীয় লিখনকে এই দু'পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

- PLENEMIC—প্রথম পদ্ধতিতে আছে কতগুলি চিহ্ন যাদের ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ এবং ভাষাতাত্ত্বিক গঠন উভয়ই রয়েছে। যেমন গোরুর মুখের ছবি থেকে α বা a-র উৎপত্তি।
- CENEMIC—প্রথম পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত বাড়তে থাকবে, এরকম লিপিতে বর্ণের সংখ্যাও ক্রমশই বাড়বে। তাই ক্রমেই শুধু গঠনকে প্রাধান্য দেওয়া হতে লাগলো। যেমন a যে গোরুর মুখ থেকে এসেছে সেই অর্থটি আর বজায় না রেখে কেবলমাত্র একটি ধ্বনির প্রতীক হিসেবে তা যে কোনো অর্থের যে কোনো শব্দের গঠনগত উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলো। চিহ্ন সংখ্যা ও জটিলতা কমে যাওয়াতে Cenemic পদ্ধতিই যে গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক তা বোঝা গেল।

চিত্রলিপি থেকে কিউনির্ফর্ম লিপির বিবর্তন

পৃথিবীর প্রাচীন লিপিসমূহ

এখনকার ইরাকের নামই আগে ছিল মেসোপটেমিয়া। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া, সুমের, অক্কাদ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপির অন্যতম দাবিদার এখানকার মানুষরা। এখানকার লিপির নাম কিউনির্ফর্ম বা কীলকলিপি। পেরেকের মতো খোঁচা খোঁচা চেহারার জন্যই এমন নাম। ল্যাটিন শব্দ 'কিউনিয়াস' মানে পেরেক বা কীলক আর 'ফরমা' হল আকৃতি। বিখ্যাত লিপি বিশারদ টমাস হাইড এই নামকরণের কৃতিত্ব পাবেন। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মানুষ মনে করতেন 'নেবো নামের দেবতাই এই লিখন পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। নরম মাটির চাকতিতে লিখে তা শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হতো। এই খোদিত লিপি থেকে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সমাজজীবন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। কীলক লিপির সবচেয়ে প্রাচীন নমুনাটি পাওয়া গেছে উরুক শহরে,

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো এই নমুনাটি। প্রাচীন সুমেরের নিসপুরে একটি মন্দিরের নিচে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিউনিফর্মে লেখা সিলমোহর পাওয়া গেছে। আসিরিয়ার রাজা আসুর বানিপাল তাঁর সংগ্রহশালায় প্রায় বাইশ হাজার সিলমোহর জমা করেছিলেন। কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই লিপির চল উঠে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত এ প্রত্নতাত্ত্বিক হেনরি ক্রেসউইক রলিনসন ইরানের বেহিস্তন পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করলেন তিনি। দেখা গেল, প্রাচীন ফারসি, ইলামাইট আর ব্যাবিলনীয় ভাষায় কীলক লিপিতে সেটি লেখা। এই লিপির পাঠোদ্ধারের মধ্য দিয়ে অতীতের অনেকখানি না-জানা অধ্যায়ও উদ্ধার করা সম্ভব হল।

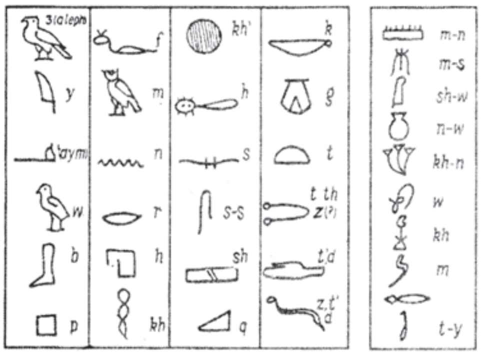

হিয়েরোগ্লিফিক লিপির বিশিষ্ট প্রতীক
১) একক ব্যাঞ্জনধ্বনি বিশিষ্ট প্রতীক;
২) দ্বিবিধ ব্যাঞ্জনধ্বনি বিশিষ্ট প্রতীক

প্রাচীন মিশরেও পাওয়া যায় প্রাচীন লিপি হিয়েরোগ্লিফিক। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল এই লিপির প্রবর্তক পাখির মাথা আর মানুষের শরীর-বিশিষ্ট দেবতা 'থথ'। হিয়েরোগ্লিফিক শব্দটা অবশ্য গ্রিক। 'হিয়োরাস' মানে পবিত্র আর 'গ্লিফেইন' শব্দের অর্থ খোদাই করা, অর্থাৎ এক কথায় পবিত্র লিপি। এ লিপির সবথেকে প্রাচীন নিদর্শনটি পৌনে সাত হাজার বছরের পুরনো।

হিয়েরোগ্লিফিক মূলত চিত্রলিপি হলেও কালক্রমে হিয়োরোগ্লিফিক খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। এই লিপির চিহ্ন-সংখ্যা কিউনিফর্মের লিপি সংখ্যার থেকে ছিল অনেক কম। ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার ছিল। স্বরচিহ্ন ছিল না, কতকগুলি চিহ্ন একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে প্রকাশ করত, কোনো কোনো চিহ্ন দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনকেও বোঝাতো। এ লিপির লিখন শুরু হতো ডানদিক থেকে বামে, তবে কখনও কখনও বাম থেকে ডানেও গিয়েরোগ্লিফিক পাওয়া যায়। প্রথমে পাথর বা কাঠে লেখা হলেও পরে প্যাপিরাস নামের নলখাগড়া পিটিয়ে পাতলা ফালি বানিয়ে কালি ও কলম দিয়ে লেখা হতো। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় এই ধরনের সত্তর লক্ষ প্যাপিরাসের পুথি ছিল। মিশরের ফারাও তৃতীয় রামেসিসের আমলে লেখা লম্বায় একশো তিরিশ ফুট আর চওড়ায় পৌনে সতেরো ফুট একটি প্যাপিরাস পাওয়া গেছে। এ.সি. হ্যারিসের আবিষ্কৃত পৃথিবীর বৃহত্তম এই প্যাপিরাসের পাতাটির নামকরণ তাঁর নামেই হয়েছে 'দ্য গ্রেট হ্যারিস প্যাপিরাস'। হিয়েরোগ্লিফিক খুবই জটিল লিপি, তাতে সূক্ষ্ম অলংকারের অনেক জটিল বাহুল্য ছিল। তাই সহজতর হিয়েরেটিক এবং আরো পরে আরও সহজ ডেমোটিক লিপি তৈরি হয়েছিল। ১৭৯৯ সালে ফরাসি দেশনায়ক নাপোলিওঁ বোনাপার্তের সেনাদলের ক্যাপ্টেন এন. বুসা মিশর বিজয়ের সময় নীলনদের মোহনায় 'স্যাঁ জুলিয়া দ্য রসেত্তা' দুর্গের দেওয়ালে আঁকিবুকি-কাটা একটি কালো পাথর দেখতে পান, ওপরওয়ালা জেনারেল মেনুকে জানিয়ে পাথরটি খুলে তা পারি শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো

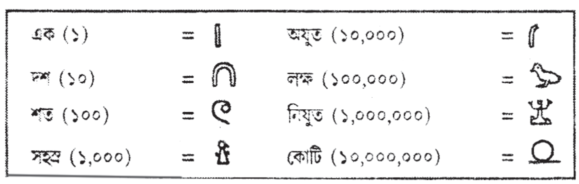

হিয়েরোগ্লিফিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি

স্বয়ং নাপোলিওঁ-র কাছে। বিখ্যাত লিপি বিশারদরা এলেন, কিন্তু এই ‘রসেত্তা পাথরে’র রহস্য দূর হলো না। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নাপেলিওঁ ইংরেজদের কাছে হেরে গেলে এই পাথরটা চলে যায় ইংরেজদের জিম্মায়। শেষ অবধি একজন ফরাসিই, জাঁ ফ্রাসোয়া শাপলিওঁ চল্লিশ বছরের ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ে পাঠোদ্ধার করলেন ওই পাথরে লেখা লিপির। বস্তুত তা ছিল যিশু খ্রিস্টের জন্মের একশো সাতানব্বই বছর আগে মিশরের রাজা পঞ্চম টলেমি এপিফানেস-এর সম্মানে লেখা একটি ঘোষণাপত্র। মিশরীয় ও গ্রিক—দু ভাষাতেই লেখা এই ঘোষণাপত্রে হিয়েরোগ্লিফিক, ডেমোটিক এবং গ্রিক লিপির ব্যবহার ছিল, উপরের চোদ্দো লাইন হিয়েরোগ্লিফিকে, মাঝের বত্রিশ লাইন ডেমোটিকে আর শেষের চুয়ান্ন লাইন ছিল গ্রিকে। প্রথম দুটি তখনও অচেনা, গ্রিক চেনা, সেই সূত্রেই চেনা হল হিয়েরোগ্লিফিক আর ডেমোটিক লিপি। খ্রি. পূ. ২০০-৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হিয়েরোটিক ও ডেমোটিক আলাদা হয়ে গেছিল। হিয়েরোটিকে কেবল মাত্র ধর্মীয় বিষয় লেখা হতো বলে রসেত্তা পাথরের লেখাটি ছিল ডেমোটিকে। এর গ্রিক পাঠটিও দূরদর্শিতার পরিচায়ক, কেননা উন্নততর গ্রিকলিপি ততদিনে চালু হয়ে গেছে, আর প্রাচীনত্বের মর্যাদা রাখতে হিয়েরোগ্লিফসের পাঠটিও ছিল। শাপোলিওঁ-র কৃতিত্বেই হিয়েরোগ্লিফিক পড়া সম্ভব হল, প্রাচীন মিশরের অনেক রহস্যও উদঘাটিত হল।

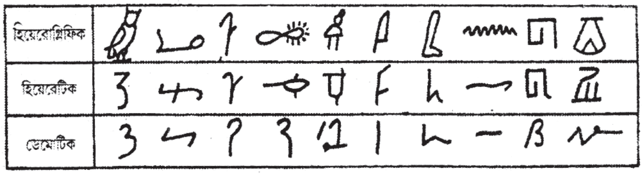

প্রাচীন ভারতবর্ষেও সিন্ধুনদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা। ১৮৫৬ সালে লাহোর থেকে করাচি রেলপথ পাতার কাজে ব্রাহ্মণাবাদ নামের একটা গ্রামের উঁচু উঁচু ঢিবি থেকে খুংড়ে বের করা নানা ঘরবাড়ির ভগ্নাবশেষ থেকে পাওয়া ইট ব্যবহার করা হচ্ছিল। এরপর ঠিক হল হরপ্পা গ্রামের ঢিবিগুলি থেকে ইট বের করে রেলপথের কাজ হবে। সেই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন জেনারেল ক্যানিংহাম। পুরনো ইটের কথা শুনে তিনি ছুটলেন হরপ্পায়, দেখেই বুঝতে পারলেন অনেক পুরনো আমলের ইট এগুলি। তাঁরই চেষ্টায় হরপ্পা এবং চারশো মাইল দূরে করাচির কাছে মহেন-জো-দারোয় খনন করে আবিষ্কৃত হল সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অবশেষ। সিলমোহর, শিলালিপি ইত্যাদি থেকে সে যুগে প্রচলিত লিপিরও সন্ধান পাওয়া গেল। এ লিপিও মূলত চিত্রলিপি। অনুসন্ধানের পর প্রায় ৪০০ বিভিন্ন চিহ্নের খোঁজ পাওয়া গেল, ওই চিহ্নগুলির মাথায় স্বরচিহ্নবোধক বিভিন্ন রেখাও দেখা গেল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই লিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার আজ অবধি কেউ করতে পারেননি। সিন্ধু লিপির সঙ্গে সুমরীয়, প্রোটো-এলমাইট, হিট্টাইট, মিশরীয়, ক্রিট দেশীয়, এমনকি চিনা লিপির প্রাথমিক রূপের বিভিন্ন মিল দেখা যায়। সম্ভবত ওইসব লিপির সঙ্গে সিন্ধুপারের মানুষদের পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গেও এর প্রভূত মিল, তবে লিপি বিশারদ হান্টার সাহেব-সহ অনেকে আবার মনে করেন এদেশেই প্রচলিত কোনো প্রাচীনতর লিপি থেকে সিন্ধুলিপির উদ্ভব এবং সিসিলীয় লিপি আর সাইপ্রাসের প্রাচীন সাইপ্রায়েট লিপিও প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুলিপিরই দান।

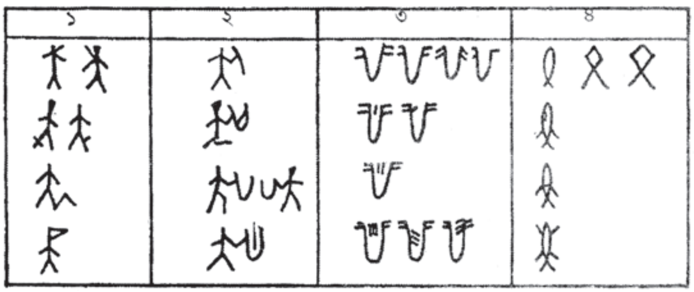

সিন্ধু উপত্যকার লিপির নমুনা– মনুষ্য ও মৎস্য চিহ্ন

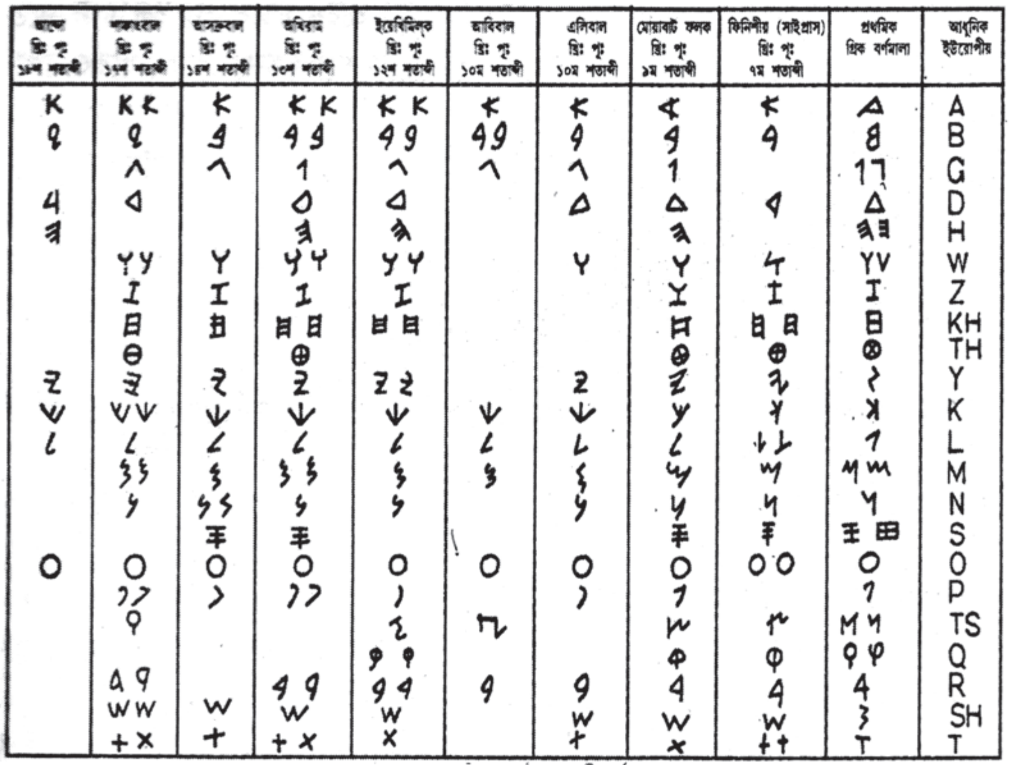

উত্তর সেমেটিক বর্ণমালার বিবর্তন

বর্ণমালার উদ্ভব ও বিবর্তন

চিত্রলিপি থেকে ধ্বনিলিপিতে পৌঁছতে মানুষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এক একটি দেশ বা সভ্যতা নিজের মতো করে বর্ণমালাও তৈরি করে নিয়েছিল। আনুমানিক সাড়ে তিন বা পৌনে চার হাজার বছর আগেই সিনাই-ক্রিট-সিরিয়া-প্যালেস্টাইন ও আশেপাশে অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে বেশ কয়েকটি বর্ণমালা তৈরি হয়েছিল। যেমন সিনাই-এর সিনাইটিক, ক্রিটের লিনিয়ার-এ ও লিনিয়ার-বি, এট্রুরিয়ার এট্রুসকান, সিরিয়ার ইউগারিট ও বিব্লস লিপি। ততদিনে দেশে দেশে বাণিজ্য শুরু হয়েছে, লিপির ক্ষেত্রেও পড়ছে পারস্পরিক প্রভাব, এভাবেই ফিনিশিয়ায় একদিন গড়ে উঠল সেমেটিক জাতির উত্তর সেমেটিক বর্ণমালা। কিউনিফর্ম এবং হিয়েরোগ্লিফিককে ঘষে মেজে বাইশটি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা তৈরি করে ফেলেছিল ফিনিশিয়রা। তবে এদের বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ছিল না, ছিল না যতি চিহ্নও। এই ফিনিশিয়দের থেকেই গ্রিকরা শিখল লিপির ব্যবহার এবং বুদ্ধি করে বর্ণমালায় পাঁচটি স্বরবর্ণও জুড়ে দিল। তবু গ্রিস নয়, সিরিয়া-প্যালেস্টাইনই বর্ণমালার আদি জন্মভূমি। মধ্যপ্রাচ্যের হিকসসরাই উত্তর সেমেটিক বর্ণমালা ভেঙে তৈরি করেছিল ফিনিশিয় এবং প্রথম দিকে হিব্রু ও সংশ্লিষ্ট শাখার বর্ণমালাগুলি। এখানে বর্ণমালার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত একটি তালিকা দেওয়া হল। তালিকাটি দেখলে বোঝা যাবে আদি সেমেটিক বা প্রোটোসেমেটিক বর্ণমালা থেকেই আধুনিক পৃথিবীর যাবতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ হওয়ার মুখে মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, হিট্টাইট, ক্রিট প্রভৃতি প্রাচীন জাতিগুলির প্রাধান্য কমে, প্রধান হয়ে ওঠে ইজরায়েল, আরামীয়, সাবীয় এবং কিছু আরব জাতি। পশ্চিম সাগর পারে হেলাসে উদিত হয় আরেক নতুন

জাতি, পরে আমরা যাদের গ্রিক বলে চিনবো। প্রোটো-সেমেটিক লিপি বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়ল। উত্তরে মূল শাখা উত্তর-সেমেটিক বর্ণমালা থেকে আরামিক, ক্যানানাইট ও গ্রিক বর্ণমালা তৈরি হল, আর দক্ষিণ-সেমেটিক বর্ণমালা থেকে জন্ম নিল সাবীয়, সাফাহিটীয় এবং থামুডেনীয় বর্ণমালা। এভাবে ক্রমশ বিভিন্ন দেশে নিজস্ব বর্ণমালা তৈরির প্রেরণাও সঞ্চালিত হল। এককথায়, আধুনিক সমস্ত প্রধান বর্ণমালাই কোনো না কোনোও ভাবে প্রোটো-সেমেটিক বর্ণমালার কাছে ঋণী।

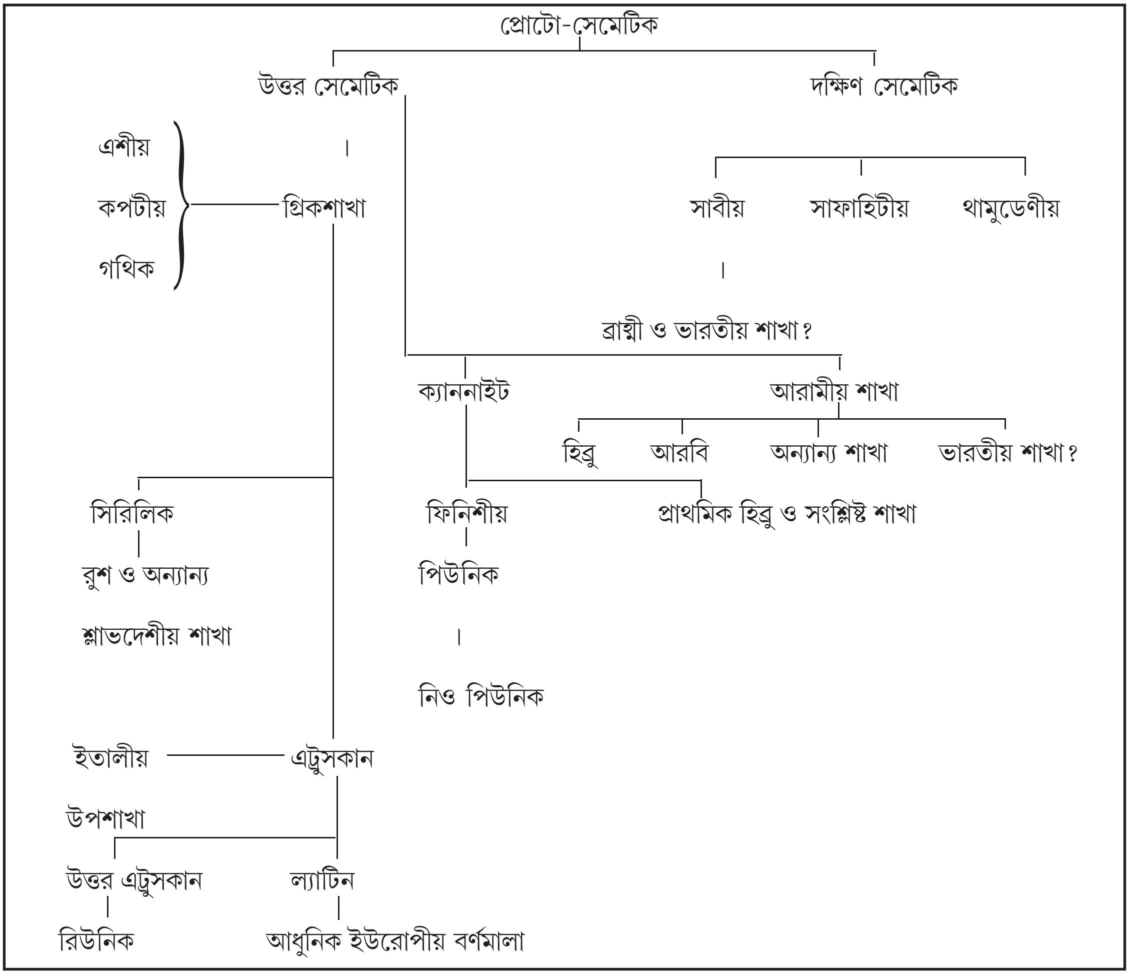

আগেই জেনেছি লিপি দুধরনের। Plemenic আর Cenemic; বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে এদের মধ্যে কিছু ভাগ আছে—

Plenemic-এর মধ্যে পড়ে

(১) ছবি (logogram) + ধ্বনি (Phonogram)—এ ধরনের লিপি হল হিয়েরোগ্লিফিক। ছবিও আছে, ধ্বনিও আছে। হিট্রি ভাষার প্রাচীন লিপি এধরনের, প্রায় ৫০০র মতো চিহ্ন।

(২) ছবি (logogram) + ধ্বনি (phonogram) + নির্দেশক (determinative)—কিউনিফর্ম লিপি এধরনের। ২০০০-এর মতো চিহ্ন।

(৩) রূপ (morph) + অক্ষর (syllable)—চিনা লিপি, এদের চিহ্ন প্রচুর, ৫০,০০০। প্রাত্যহিক ব্যবহৃত চিহ্নও প্রায় ৮০০০।

Cenemic লিপির ধরন :

(১) অক্ষরলিপি—জাপানি কান্ লিপি। এদের প্রাথমিক চিহ্ন ৪৬ টির মতো।

(২) ব্যঞ্জনলিপি—এতে স্বরবর্ণ নেই। ফিনিশীয় লিপি। ২২ টি মতো চিহ্ন।

(৩) স্বাধীন ব্যঞ্জন ও স্বাধীন স্বরধ্বনিলিপি—গ্রিক ও রোমান লিপি, ২৬ টির মতো চিহ্ন।

(৪) স্বাধীন স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরধ্বনি—চিহ্ন সংখ্যা ১৮২টি প্রায়। ইথিওপিয়ার লিপি, সংস্কৃত এবং বাংলা লিপি। শুধু ব্যঞ্জন ছাড়াও যুক্তব্যঞ্জন থাকায় চিহ্ন সংখ্যা ১৮২ টির মতো ব্রাহ্মীও এরকমই।

অন্য জাতির থেকে তাদের লিপি গ্রহণ করে তার উন্নতি ঘটিয়েছে বহু জাতি। লিপির বিবর্তন ঘটেছে এভাবেই।

প্রদাতা ভাষা	প্রাচীন চিত্র পদ্ধতি	নতুন চিহ্ন পদ্ধতি	গ্রহীতা ভাষা
(১) সুমেরীয় লিপি	চিত্রলিপি	চিত্র + অক্ষরলিপি	অক্কাদীয়
(২) ফিনিশীয় লিপি	ব্যঞ্জনলিপি (ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বর লুকিয়ে থাকবে)	বর্ণলিপি (ব্যঞ্জন ও স্বর আলাদা)	গ্রিক
(৩) চিনা লিপি	রূপ + অক্ষর	অক্ষর লিপি	জাপানি

International Phonetic Alphabet (IPA) :

পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার মতো লিপির বৈচিত্র্য যে কম নয়, তা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছো। অথচ মানুষের প্রয়োজন এমন অভিন্ন লিখন পদ্ধতি যা পৃথিবীর যে কোনও ভাষা উচ্চারিত যাবতীয় ধ্বনিকে চিহ্নিত করতে পারে। এই উদ্দেশ্য থেকেই Isaac Pitman এবং Henry Ellis-এর মডেল অনুসারে ১৮৮৮ সালে Paul Passy ও তাঁর প্রতিষ্ঠান Association Phonétique International [International Phonetic Association] আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালা বা IPA-এর প্রকাশ করেন। অবশ্য মনে রাখা দরকার, এর বেশির ভাগ চিহ্নই রোমান ও গ্রিক লিপি থেকে নেওয়া।

IPA-র ব্যবহার

(১) শব্দের ঠিক উচ্চারণ বোঝাতে অভিধানে।

(২) পূর্বে লিখিত রূপ নেই এমন ভাষার নতুন লিখন পদ্ধতি প্রণয়নে।

(৩) বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অচেনা লিপিতে লেখা ধ্বনির লিপ্যন্তরে।

বাংলা লিপির উদ্ভব :

কতদিন আগে প্রথম বাংলা লিপির ব্যবহার শুরু ঠিক করে বলা যায় না, তবে এ লিপিকে ভারতীয় লিপি হিসেবে ধরা যায়। হরপ্পালিপি ছাড়া এদেশের প্রাচীন দুটি লিপি যথাক্রমে—খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী।

খরোষ্ঠী :

উত্তরের আর্যরা আসার আগে Nomadic আর্যরা (যাযাবর আর্য) জলপথে বাংলাদেশে আসে এমন প্রমাণ আছে। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গিয়ে এরাই আজকের বাঙালি জাতিকে তৈরি করেছিলেন। আর্যরা আসার আগে যারা এখানে থাকতেন তারা নিগ্রো জাতি। বিশেষত উত্তরের আর্যদের আক্রমণ ও অত্যাচারে যাঁরা আন্দামান ও নিকোবরের দিকে চলে যান। কিছু ছড়িয়ে যান ওড়িশা ও বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে। নিগ্রো—অস্ট্রিক—দ্রাবিড় এরা যথাক্রমে বাংলায় এসেছেন ও চলে গেছেন। আর্যদের সাথে মিশেও গেছেন। এই বিস্তৃত ও বিচিত্র মিশ্রণই

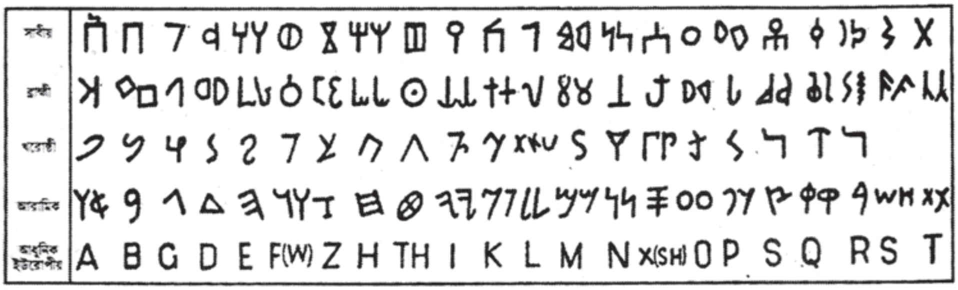

সাবীয়, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী এবং আরামিক বর্ণমালার নমুনা

বাঙালিজাতির উদ্ভবসূত্র। ফসিল থেকে জানা যায় ১৫,০০০-১০,০০০ বছর আগে নিগ্রোরা এখানে থাকতেন, জাতির সাথে ভাষা ও ভাষার সাথে লিপির নিবিড় একাত্মতার দাবি কোনোদিনই নেই, তাই মেসোপটেমিয়ার Aramic রা ১৩০০খ্রি. পূ.— ১১০০ খ্রি. পূ. নাগাদ আরব থেকে চলে আসার আগে ভারতে থাকতেন—এরকম কল্পনা না করে আরামীয় ও খরোষ্ঠীর চরিত্রগত মিল থেকে এই অনুমানই করা শ্রেয় যে আরামীয় লিপির আদর্শেই খরোষ্ঠীর চরিত্রগত মিল থেকে এই অনুমানই করা শ্রেয় যে আরামীয় লিপির আদর্শেই খরোষ্ঠীর উদ্ভব। ভারত-সিরিয়া-আরব-মেসোপটেমিয়া জোড়া বাণিজ্যিক আদান-প্রদান অবশ্যই ঐতিহাসিক বাস্তব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আরামীয় লিপি ব্যবহৃত হতো। অনুমান করা যায় ভারতীয় বণিকরাও এই লিপি জানতেন এবং এভাবেই খরোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের মতে 'খর' বা গাধার ওষ্ঠের মতো দেখতে বলেই খরোষ্ঠীলিপির এমন নামকরণ। ৩০০ খ্রি. পূ. নাগাদ এই লিপি ভারতের বাইরে চলে যায় এবং ৫০০ খ্রি. নাগাদ লোপ পায়। মধ্য এশিয়া ও ভারতের মুদ্রা, কাষ্ঠফলক, শিলালিপি ও চামড়ায় এর নিদর্শন রয়েছে। অশোকের কিছু শিলালিপি খরোষ্ঠীতে। বাকিগুলি অবশ্য ব্রাহ্মীতে।

পারস্যে দারায়ুস (প্রথম) এর লিপিতে খরোষ্ঠীর ব্যবহার আছে, খ্রি. পূ. ১৫০০-১০০০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ খরোষ্ঠীকে অপসৃত করে ব্রাহ্মীলিপিই ব্যাপক প্রাধান্য ও বিস্তার লাভ করে। তাই খরোষ্ঠীকে বাংলা লিপির পূর্বসূরী বলা ঠিক নয়।

ব্রাহ্মী :

ব্রাহ্মীলিপি কোথা থেকে এল তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, কোনো মতই সম্পূর্ণ সন্তোষদায়ক নয়। Dowson, Cunningham, Thomas—এঁরা বলেন ব্রাহ্মী এসেছে প্রাচীন সিন্ধুলিপি থেকে। কিন্তু এ কল্পনা অনেকটাই শূন্যে দাঁড়িয়ে, কেননা সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনো হয়নি। আর তাছাড়া এঁরা বলেন, প্রাচীন সিন্ধুলিপিকে বদলান

ভারতীয় পুরোহিতরা, 'ব্রাহ্মণ' শব্দ আর 'ব্রাহ্মী' শব্দের ধ্বনিগত সাদৃশ্য এঁদের এরকম কল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে। যদিও আদতে শব্দ দুটি এক নয়।

অন্যমতে, ব্রাহ্মীলিপি এসেছে বিদেশ থেকে এবং তা হল গ্রিস। Princeep-Rochette আলেকজান্ডারের আক্রমণ সূত্রে ব্রাহ্মীর ভারতে আগমন—এমনটা বলতে চান। কিন্তু, ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে গ্রিকরা না আসলেও ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে এবং গ্রিক আক্রমণের ২০০-৩০০ বছর আগেই খ্রি. পূ. ৭০০ অব্দ নাগাদই ব্রাহ্মীতে লেখা অনুশাসনও পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ফিনিশিয় ব্যঞ্জনলিপিকে গ্রিকরা পাল্টে তাতে স্বরবর্ণও যোগ করে। কিন্তুব্রাহ্মীর প্রথমদিকে স্বর ও ব্যঞ্জন নিয়ে প্রায়শই গোলমাল দেখা যাবে। সুতরাং, উন্নততর গ্রিকলিপি থেকে যে তা উদ্ভূত নয় তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

তৃতীয় মতে, সেমেটিক লিপি থেকে ব্রাহ্মী এসেছে। Jones, Kopler—এঁরা এরকম মনে করেন। এঁরা বলেন ফিনিশিয় লিপিই ব্রাহ্মীর জন্ম দিয়েছে। কারণ, প্রাচীন ফিনিশিয় লিপির সাথে ব্রাহ্মীর কিছু চিত্রগত মিল। যদিও পরবর্তী ফিনিশিয় লিপির সাথে এই সাদৃশ্য ক্রমেই এসেছে। ফলে এই মতও সংশয়াতীত নয়। তাছাড়া ব্রাহ্মীতে যে স্বরের চিহ্ন দেওয়া হয় ফিনিশিয়তে তা নেই।

কেউ কেউ আরবীয় লিপিকে ব্রাহ্মী-র উৎস মনে করেন। কিন্তু ব্রাহ্মী-র চলন আরবির মতো ডান থেকে বামে নয়। ফলে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

Davids বলেন কিউনিফর্ম থেকে এসেছে ব্রাহ্মীলিপি। কিন্তু ব্রাহ্মী বহু আগে পাঠ করা গেলেও কিউনিফর্ম পাঠ করা গেছে অল্প কিছুদিন আগে। সুতরাং এই মত-ও মেনে নেওয়া যায় না।

James আরামীয় লিপিকে ব্রাহ্মী-র জন্মদাতা বলতে চান। যোগাযোগ অস্বীকার করা না গেলেও এই মত-ও সম্পূর্ণ মানা যাবে না। কারণ আরামীয় বর্ণলিপি, অথচ ব্রাহ্মী অংশত অক্ষরলিপি। আধুনিকতর বর্ণলিপি থেকে অক্ষরলিপি-র উৎপত্তি—এমনটা হতে পারে না।

Cast বলেন, খ্রি. পূ. ৭ম-৮ম শতকে ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে ব্রাহ্মীলিপি তৈরি করে। তাদের সামনে দৃষ্টান্ত ছিল পশ্চিম এশিয়া সহ অন্যান্য বিদেশি লিপির। চরিত্রগতভাবে তা প্রাক্-বর্ণলিপি। অক্ষরলিপি ও বর্ণলিপির মাঝখানে আছে এই লিপি।

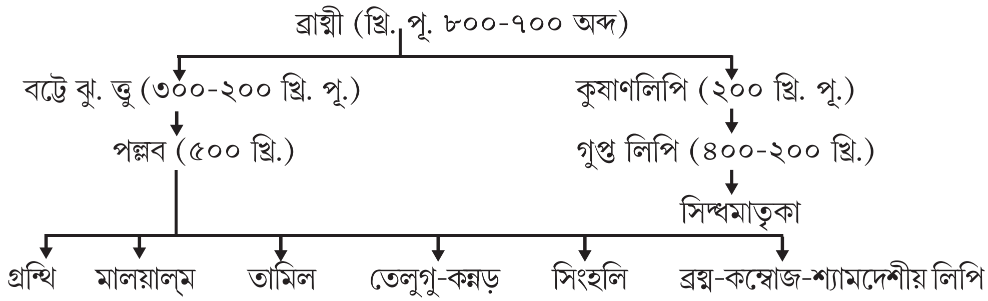

কুষাণ লিপি পরবর্তী ধাপ গুপ্তলিপি। ৪০০-৫০০ খ্রি. প্রচলিত গুপ্তলিপি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে জন্ম দিচ্ছে সিদ্ধমাতৃকা লিপির। এই সিদ্ধমাতৃকা থেকেই কুটিল লিপি এলো সপ্তম শতকে।

লিখন-পদ্ধতি জটিল, তাই ওরকম নাম। অর্থাৎ লিপি কৌণিক নয়, ঘুরিয়ে লেখা।

কুটিল লিপির অঞ্চল অনুযায়ী পাঁচটি ভাগ—

(ক) উত্তর-পশ্চিম (৮০০ খ্রি.)—শারদা লিপি, শারদার দুটি ধারা—

(I) পূর্বদেশের প্রভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত তিব্বতি লিপি।

(II) কাশ্মীরি ও গুরুমুখী লিপি (অপরিবর্তিত ও অপ্রভাবিত শারদালিপি)।

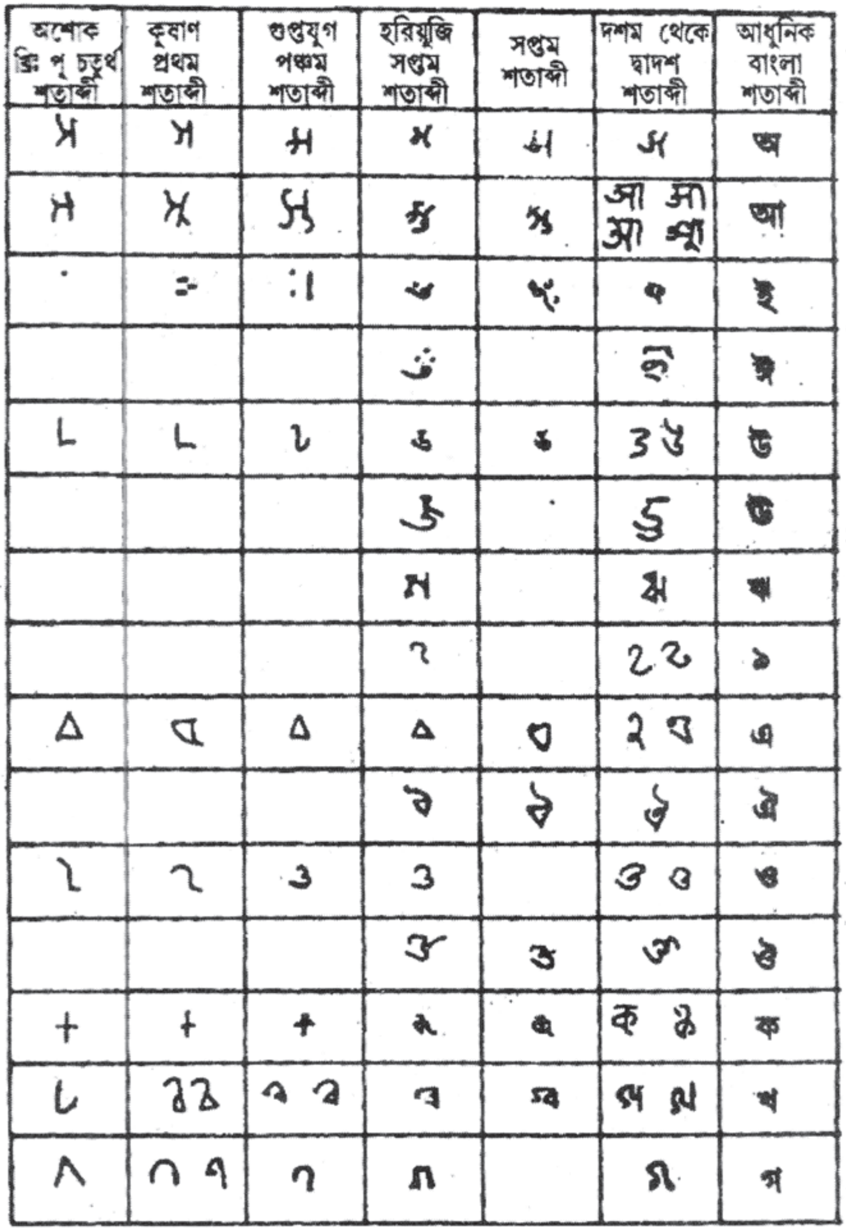

বংলা লিপির বিবর্তন

(খ) মধ্যদেশ, রাজস্থান, গুর্জ্জরে প্রচলিত ৮ম শতকের নাগরলিপি। এর তিনটি ধারা,

(I) দেবনাগরী বা নাগরী লিপি।

(II) গুজরাতি লিপি এবং

(III) কায়থী লিপি, কায়স্তদের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ ঘরানা এটি।

(গ) মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক খোটানি ভাষার লিপি। এতে একটা রামায়ণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধজাতক ও খোটানি বা তিব্বতি গল্পেও রামায়ণের কাহিনি পাওয়া যায়। 'কাকামিথ'—রামায়ণের পুরনো লৌকিক গল্পকথা। এই গল্পগুলি থেকেই তার সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও মহকাব্যিক গুণ নিয়ে অনেক পরে রামায়ণ সৃষ্ট হবে। এইরকম গল্প পাওয়া যাবে যবদ্বীপ, বালি, সুমাত্রাতেও।

কুটিল লিপি মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলন পেয়েছিল, এর থেকে তৎকালীন ভারতের সমুদ্র বাণিজ্যসহ বহির্বাণিজ্যে সক্রিয়তা ও প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঘ) যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত কুটিল লিপির যবদ্বীপীয় শাখা (৯ম শতক)।

(ঙ) ৮ম শতকে পূর্বভারতের গৌড়ী বা প্রত্ন-বাংলা লিপি। তখনকার প্রাপ্ত মুদ্রাগুলিতে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী উভয়ের মিশ্রলিপি পাওয়া গেছে। তাই, ১১শ শতক নয়, আদিতম বাংলা লিপির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে ৮ম শতকে।

এর চার শাখা—

প্রত্ন-বাংলা লিপি

নেপালি | ওড়িয়া | মৈথিলি | বাংলা-অহমিয়া

৮ম থেকে ১১শ-১২শ শতকে এই লিপিগুলির বিবর্তন আরম্ভ হয়।

Bühler-এর মতে নাগরী লিপি (ক) পূর্বভারতীয় এবং (খ) পশ্চিম ভারতীয়—দুটি শাখায় ভাগ হয়ে যায় এবং পূর্বভারতী নাগরীলিপি থেকেই প্রত্ন-বাংলা লিপির উদ্ভব।

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এস.এন. চক্রবর্তী জানান, প্রস্তরখোদিত উত্তরভারতীয় পশ্চিমা শাখা থেকে সিদ্ধমাতৃকা এবং পূর্বশাখা থেকে প্রত্ন-বাংলা লিপির উদ্ভব।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য সিদ্ধমাতৃকা থেকেই বাংলার উদ্ভব বলছেন, সুকুমার সেন বলছেন কুটিল লিপি থেকে বাংলা লিপি এসেছে। পরেশচন্দ্র মজুমদার মতগুলিকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন, রামেশ্বর শ-ও তাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যদিও বহু আগেই চেষ্টা করেছিলেন বাংলা লিপিকে ৮ম শতক অবধি পিছোতে। তারাপদ ভট্টাচার্যও চর্যা ও সমকালীন পুঁথি পড়ে একই মত দিচ্ছেন।

এককথায়, ৮ম থেকে ১১শ শতক নাগাদ বাংলা লিপির উদ্ভব। এরপর নানাযুগ পেরিয়ে, তালপাতা ও ভূর্জপত্রের সময় পেরিয়ে ১৮ শতকে পেলাম তার মুদ্রিত রূপ। আর আজ তো ইন্টারনেটেও তোমরা বাংলা লিপিতে পড়তে পারো, লিখতে পারো, পারো ভাবের আদানপ্রদান করতে। বাংলা লিপির জয়যাত্রা এভাবেই অব্যাহত রয়েছে।

এই অধ্যায়ের ছবিগুলি বিষ্ণু বসু ও অশোক মুখোপাধ্যায়ের 'ভাষার কথা লিপির কথা' বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষাবৈচিত্র্য ও বাংলা ভাষা

ভাষা যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায়, আগের অধ্যায়গুলিতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে ইন্দো-ইরানীয় হয়ে কীভাবে তিনহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আজকের বাংলা এল, সেই বিবর্তনের ধাপগুলো নিয়ে যে চর্চা করা হয় তাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের। কিন্তু ভাষা শুধু সময়ের সঙ্গেই পালটায় না, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেও থাকে একটি ভাষার নানা রূপ। ভাষার ধ্বনি ও রূপ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়বৃত্তে এই যে আলোচনা বা চর্চা, একে বলা যেতে পারে এককালীন ভাষাতত্ত্ব।—'যদি মনে করে নিই, একটা মুহূর্তে ভাষা স্থির, তাহলে সেই সময়ের ভাষাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব তার অতীতের কথা না এনেও। যেহেতু ভাষার পরিবর্তন অতি ধীর গতি তাই এমন মুহূর্ত বিশ্লেষণের জন্য বেছে নেওয়া অসমীচীন নয়। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব দ্বিকালীন (diachronic) কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। 'ক' কাল থেকে 'খ' কালে, 'খ' কাল থেকে 'গ' কালে কীভাবে ভাষা পরিবর্তিত হচ্ছে তার কথা বলে। কিন্তু এককালীন (Synchronic) ভাষাচর্চাও সম্ভব। এককালীন ভাষাতত্ত্ব বিশেষ একটি কালকে বেছে নেয়, পূর্ববর্তী কালের সঙ্গে সেই কালের সম্পর্ক আবিষ্কার করচে চায় না, সেই বিশেষ কালখণ্ডে ভাষার রূপটির পরিচয় নিতে চায়। নীচের চিত্রটি দেখলে এই দু-ধরনের ভাষাচর্চার পার্থক্য এবং এদের যোগসূত্রটি বোঝা যাবে :

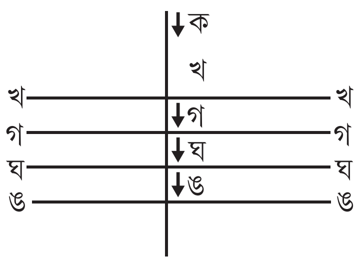

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছে 'ক' যুগের ভাষা 'খ' যুগে কতটা পরিবর্তিত হল, কোন কোন প্রক্রিয়ায় সেই পরিবর্তনগুলি এল।... এইভাবে ফুটিয়ে তুলতে চাইছে পরিবর্তমান ভাষাকে, একটি বহমান নদীকে'*। এককালীন ভাষাতত্ত্বের আগ্রহ কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে প্রধানত একটি কালখণ্ডে, হতে পারে সেটা 'ক' বা 'খ' বা 'গ'। অর্থাৎ ধরা যাক 'ক' কালে ভাষার রূপ কীরকম ছিল, ধ্বনি কীরকম ছিল এবং 'ক' কালে সেই ভাষারই কত রকম বৈচিত্র্য ছিল। যেমন ধরো, তুমি যে ভাষায় অনর্গল বন্ধুদের মধ্যে কথা বলো, আর যে ভাষায় তুমি কোনো বিষয় নিয়ে অনেকের সামনে বক্তৃতা দাও, এই দুটি ভাষা কি সম্পূর্ণ এক? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটু কি পরিশীলিত বা মার্জিত হয়ে যায় না তোমার ভাষা? আবার যখন তুমি লেখো কোনো প্রবন্ধ, তখনও কি আবার একটু আলাদা হয়ে যায় না তোমার ভাষা? ধরো তুমি থাকো পুরুলিয়া বা কোচবিহার জেলায়, তোমার কথার সঙ্গে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে থাকা তোমার কোনো বন্ধুর ভাষা কি হুবহু এক? প্রতিক্ষেত্রে দেখবে একই বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে বাংলা ভাষারই

* শিশির কুমার দাস, ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপীরাস

নানা রকমফের। আর এটা যে শুধু বাংলা ভাষার ব্যাপার, এরকম একেবারেই নয়। পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যেই এটা দেখা যায়। তবে যে ভাষার ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশি, সেই ভাষার ক্ষেত্রে এই রকমফেরের ধরন ও সংখ্যাও বেশি।

এখন দেখা গেছে কোনো ভাষার যতটা ভৌগোলিক বিস্তার ঘটেছে, নানা অঞ্চলে সে ভাষার রূপ আলাদা হয়ে গেছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনার মানুষের মুখের ভাষা আর পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মানুষের মুখের ভাষা কিংবা জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের মানুষের মুখের ভাষা আলাদা। সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেনঃ রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। ভাষার এই আঞ্চলিক রূপকে 'উপভাষা' (Dialect) বলা হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি প্রধান উপভাষা। রাঢ়ী বলতে ভাগীরথী-হুগলি নদীর আশেপাশে ব্যবহৃত বাংলা; বরেন্দ্রী বলতে মালদা, দিনাজপুর; বঙ্গালী বলতে বাংলাদেশের ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি; কামরূপী হল জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসামের কাছাড় ইত্যাদি আর ঝাড়খণ্ডী হল পশ্চিমবাংলার পশ্চিমপ্রান্তের ঝাড়খণ্ডের মানভূম-সিংভূম ও ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন পুরুলিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে এতগুলি যদি বাংলার ঔপভাষিক অঞ্চল হয়, তাহলে কোন অঞ্চলের ভাষা 'বাংলা'? আসলে যে-কোন ভাষা হল তার নানা উপভাষার একটা বিমূর্ত রূপ। এই সব উপভাষা মিলিয়েই বাংলা ভাষা। এই উপভাষাগুলোর মধ্যে কোনো একটি উপভাষাকে 'Standard' বা মান্য ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। যেমন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষাই হল মান্য ভাষা। মান্যচলিত ভাষাও শেষপর্যন্ত অন্যান্য উপভাষাগুলোর মতোই একটি উপভাষামাত্র। মনে রাখতে হবে, এই মান্য বাংলাই একমাত্র বাংলা নয়, বাংলা হল, যত জন মানুষ বাংলা বলে তার একটা সাধারণ রূপ। মান্যচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃত যে উপভাষা তা অন্যান্য উপভাষাগুলির তুলনায় 'উন্নত' নয়, 'অনুন্নত'ও নয়; আসলে প্রত্যেকটি উপভাষার কোনোটাই একে অপরের থেকে 'উন্নত' বা 'অনুন্নত', 'ভালো' কিংবা 'খারাপ' নয়। তাহলে এতগুলো উপভাষার মধ্যে কী করে একটি উপভাষা 'মান্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে? প্রথমেই বলি, এই যোগ্যতা অর্জন নির্ভর করে না কোনো ভাষাগত কারণের উপর, বরং নির্ভর করে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপর।

বাংলা ভাষার যে অঞ্চলের ভাষিক রূপটি 'মান্য' বলে চিহ্নিত হয়েছে, অতীতের নানা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সেই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। ইংরেজ আমলে প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল কলকাতা। এছাড়াও পর্তুগিজরা হুগলিতে, ফরাসিরা চন্দননগরে, ওলন্দাজরা শ্রীরামপুরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। আবার ভাগীরথী-হুগলি নদীর দুই তীরেই একসময় গড়ে উঠেছিল এক বিশাল শিল্পাঞ্চল। এখনও এ রাজ্যের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। সুতরাং, এ অঞ্চলের কথ্যভাষাই মান্য কথ্যভাষা হয়ে উঠেছে; এর সঙ্গে ভাষাগত কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে dialect continuum বিষয়ে বলা প্রয়োজন? ডায়ালেক্ট কনটিনাম হল এমন অনেক উপভাষার শৃঙ্খল, যেখানে ধরা যাক 'উপভাষা-১' বোধগম্যতার দিক থেকে 'উপভাষা-২'-এর খুব কাছাকাছি, 'উপভাষা-৩'-এর ক্ষেত্রে বোধগম্যতা আগের তুলনায় কম, 'উপভাষা-৪'-এর ক্ষেত্রে বোধগম্যতা আরেকটু কম। এইভাবে হয়তো 'উপভাষা-৮'-এর ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যারা 'উপভাষা-১'-এ কথা বলে তারা 'উপভাষা-৮' বুঝতে পারছে

না। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাবে ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষেরা হয়তো চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা বুঝতে পারছেন না, যদিও তাঁরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। আবার দেখা যাবে এই ওড়িশা-সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুরের বাংলায় কথা বলা মানুষটি সহজেই বুঝতে পারেন মেদিনীপুর-সংলগ্ন ওড়িশা অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য-ওড়িয়া ভাষার রূপটি। যেহেতু উপভাষা ও ভাষার পৃথক্‌ীকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সূচক 'বোধগম্যতা', মনে হতে পারে ওই বিশেষ অঞ্চলের দুটি উপভাষা (একটি বাংলা ভাষার ও অন্যটি অন্যটি ওড়িয়া ভাষার) একই ভাষার সম্পর্কিত। কীভাবে সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে কোনটি কোন ভাষার উপভাষা? দেখা যাবে বাংলা ভাষার মানুষটি ওই বিশেষ ওড়িয়া ভাষার কথ্যরূপটি বুঝতে পারলেও, তাঁর মান্য-ওড়িয়া বুঝতে অসুবিধে হবে, কিন্তু বুঝতে পারবেন মান্য বাংলা। আবার চট্টগ্রামের মানুষটি মেদিনীপুরের ওই মানুষটির কথ্য-বাংলা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারেন মান্য বাংলা।

ভৌগোলিক অঞ্চলের বিভিন্নতার কারণে যেমন সৃষ্টি হয় উপভাষার, তেমনি যে সমাজে আমরা থাকি সেখানেও দেখা যায় ভাষার নানান বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় বিত্তের কারণে, শিক্ষার কারণে, জাত-ধর্ম-বর্ণের কারণে, পেশাগত কারণে ইত্যাদি। প্রথমেই বলি জাত-ধর্ম-বর্ণের যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে খুব একটা প্রকট নয়। যেমন তামিল ভাষায় উচ্চবর্ণ বা ব্রাহ্মণদের কথার সঙ্গে নিম্নবর্ণের ভাষার ফারাক প্রচুর। কিন্তু অন্য কারণগুলো বাংলাভাষাতেও দেখা যায়। যারা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হয়ে ওঠে, স্কুল-কলেজের ভাষার সংস্পর্শে এসে বদলে যায় তাদের ভাষা। বাড়িতে হয়তো তারা বাড়ির ভাষাতে কথা বলে, কিন্তু বাড়ির বাইরে কথা বলার ক্ষেত্রে চলে আসে মান্য বাংলা বলার ঝোঁক। আসলে 'শ্রেণি'র ধারণাও বদলে যায় দ্রুত। অশিক্ষিত কোনো মানুষের সন্তান শিক্ষিত হয়ে এবং পেশার পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য শ্রেণিতে যেতে পারে এবং এই শ্রেণিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে তার ভাষাতেও। ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় এই ধরনের গবেষণামূলক কাজের সংখ্যাও প্রচুর। এইভাবে সামাজিক স্তরভেদে ভাষার এই বৈচিত্র্যকে বলে সমাজভাষা বা Sociolect। আবার একই শ্রেণিতে থাকা দুটি মানুষের মুখের ভাষাও যে সবসময় এক হবে, তার কোনো মানে নেই। ধরো তোমার স্কুলে যতজন মাস্টারমশাই বা দিদিমণি আছেন, তাঁরা কি সবাই একইরকম ভাবে কথা বলেন? ধরে নিতে পারো যে তাঁরা মোটামুটি একই শ্রেণিভুক্ত এবং কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে একই অঞ্চলের মানুষ। এক ব্যক্তির ভাষার সঙ্গে আর এক ব্যক্তির ভাষার এই যে ফারাক, ব্যক্তির ভাষার মধ্যে এই যে বৈচিত্র্য, তাকে বলা যেতে পারে ব্যক্তিভাষা বা বিভাষা বা ideolect। আসলে 'বাংলা ভাষা' বললে বুঝতে হবে এ সবকটিকেই। স্থান, শ্রেণি বা ব্যক্তিগত নানান ফারাক সত্ত্বেও যে সাধারণরূপ ফুটে ওঠে, তাকেই আমরা 'ভাষা' বলে চিহ্নিত করি। প্রত্যেকটিই একটি জীবিত ভাষার বৈশিষ্ট্য, এগুলির কোনোটাই বেশি গুরুত্বের বা তাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়। এমনকি গালাগাল, রকের ভাষা, অপরাধ-জগতের ভাষা, প্রযুক্তির ভাষা, পরিভাষা সবই বৈচিত্র্যের অংশ। একটি মজার কথা বলে শেষ করি: বাংলায় যেমন সম্ভ্রম ও নৈকট্য অর্থে তিনরকম বৈচিত্র্য ব্যবহার করি—তুই, তুমি, আপনি এবং সেই কারণে পালটে যায় ক্রিয়াও। কোরীয় ভাষায় এই অর্থে ৬টি বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সুতরাং, একটি ভাষিক অঞ্চলে ও সমাজে একজন মানুষের কথার মধ্যেই থাকে অনেকগুলো স্তর। প্রথমে তিনি নিজেকে, তারপর তাঁর পেশাকে এবং শ্রেণিকে বা এককথায় তাঁর সমাজকে, তারপর তাঁর উপভাষিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করেন এবং শেষপর্যন্ত পৌঁছান মান্য ভাষায়। এই কথার মধ্যে সরলীকরণ হয়তো আছে, কিন্তু যথাযথ ভাষিক অবস্থান নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল। নীচে এভাবেই স্তরগুলিকে দেখানো যেতে পারে :

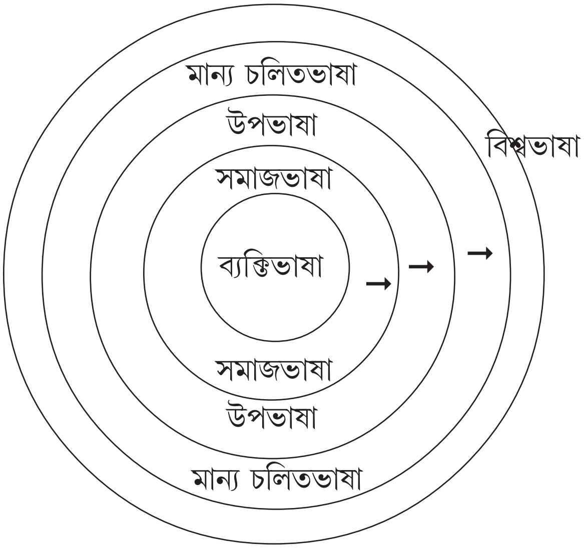

সাধু ও চলিতরীতি :

উপরের এ সবই ঘটে প্রধানত কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে। কিন্তু লেখার ভাষায় কি কোনো বৈচিত্র্য আছে? বাংলা ভাষার লিখিত রূপের দিকে তাকালে সেখানেও আমরা প্রধানত দুটি রূপ দেখতে পাব। একটি সাধু, অন্যটি চলিতরীতি।

এখন খুব একটা দেখা যায় না, কিন্তু উনিশ শতকে লিখিত গদ্যে অধিক সংখ্যক বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ, ক্রিয়া-সর্বনামের দীর্ঘরূপ, সমাসবদ্ধ পদ এবং বাক্যের পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতাসম্পন্ন বিদগ্ধ, গম্ভীর ও সাহিত্যে সীমাবদ্ধ যে ভাষা, তাকেই সাধুভাষা বলা হয়। অন্যদিকে কথ্যভাষার প্রধানত মান্য কথ্যভাষার কাছাকাছি, তদ্ভব শব্দ, ক্রিয়া-সর্বনাম-অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহারে এবং বাক্যে পদবিন্যাসের কিছুটা শিথিল নিয়মসম্বলিত যে বাংলা ভাষা তাকে আমরা চলিতরীতি বলি।

উনিশ শতকে লিখিত বাংলা ভাষা হিসেবে যখন সাধুরীতির প্রচলন ছিল ব্যাপক, তখন চলিতরীতির ধারাটি ছিল ক্ষীণ। সাধুরীতির রূপটি গড়ে ওঠে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের হাতে; তারপরই রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'-এ আরও যুক্তিনির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ রূপটি পাওয়া যায় এবং তিনি এই 'সাধুভাষা' কথাটি ব্যবহার করেন। উনিশ শতক জুড়ে বাংলা লেখার ক্ষেত্রে সাধুরীতির এই গৌরবময়তায় পাশে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র চলিতরীতির উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। পরে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্র'কে ঘিরে চলিতরীতি ক্রমশই স্থান করে নেয় সাহিত্যের অঙ্গনে। তারপর ক্রমেই সাধুরীতির ধারাটি হয়ে এল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, চলিতরীতি হলো লিখিত বাংলা ভাষার প্রধান বাহন।

সাধু আর চলিতরীতির প্রধান পার্থক্য সর্বনাম এবং ক্রিয়ার রূপে। এছাড়া আরও কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। নীচে পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে দেখানো হল।

চলিতরীতির মূল ভিত্তি মৌখিক ভাষা। এই কারণে চলিতরীতির লিখিত রূপেও অনেক সময় মৌখিক উচ্চারণের সরাসরি প্রভাব দেখা যায়।

সাধু	**চলিত**
কোন, কোনও	কোনো
কর	করো
দেখে	দ্যাখে

বাংলা ভাষার মৌখিক উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ তারতম্য নেই বলে তদ্ভব শব্দে হ্রস্বস্বর ব্যবহারের রীতি চলিতরীতিতে বহুল প্রচলিত।

সাধু	**চলিত**
পাখী	পাখি
রূপা	রুপো

মৌখিক ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্ব্যক্ষরতা বা দ্বিমাত্রিকতা চলিতরীতিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সাধু	**চলিত**
জানালা	জান্‌লা
রবিবার	রোব্‌বার

দ্বিবচনবাচক শব্দগুলি সাধু ও চলিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সাধু	**চলিত**
ভ্রাতৃদ্বয়	দুই ভাই, ভাই দুটি
পাখী দুটি	পাখি দুটো
মন্দিরদ্বয়	জোড়ামন্দির

একবচনের ক্ষেত্রে সাধুতে-'টি' বা 'খানি' নির্দেশকগুলি যুক্ত হয়, চলিতে নির্দিষ্ট কর্তার সঙ্গে যুক্ত হয় '-টা' বা '-খানা'। বহুবচনে সাধুরীতিতে '-গুলি' নির্দেশক যুক্ত হয়, চলিতে তা হয়ে যায় '-গুলো।'

সাধু	**চলিত**
ছেলেটি	ছেলেটা
বইখানি	বইখানা
গাছগুলি	গাছগুলো

চলিতরীতিতে অনেক সময় মৌখিক ভাষার ঢং-এ বিভিন্ন কারকচিহ্ন তথা বিভক্তি লোপ পেয়ে যায়।

কর্ম : তিনি <u>ছাত্র</u> পড়িয়ে সংসার চালান।

করণ : তারা খুব <u>তাস</u> পেটাচ্ছে।

অপাদান : ট্যাংক-উপচানো জলে সব ভেসে গেল।

অধিকরণ : আমি গাছপাকা আম খুব ভালোবাসি।

সাধুরীতির সর্বনামগুলি (মূলত, প্রথমপুরুষ এবং নির্দেশক) চলিতে সংক্ষিপ্তরূপে ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলিত
তাহার/তাঁহার	তারা/তাঁরা
তাহাদের/তাহাদিগের	তাদের/তাদিগের
তাহাদিগকে	তাদেরকে/তাদের
কাহারা	কারা

সাধুরীতি ক্রিয়ারীতির থেকে চলিতভাষার ক্রিয়ারীতির সংক্ষিপ্ততর।

	সাধু	চলিত
ঘটমান বর্তমান -	করিতেছে	করছে
	করিতেছ	করছ
	করিতেছিস	করছিস
	করিতেছেন	করছেন
	করিতেছে	করছে
পুরাঘটিত বর্তমান -	করিয়াছি	করেছি
	করিয়াছ	করেছ
	করিয়াছিস	করেছিস
	করিয়াছেন	করেছেন
	করিয়াছে	করেছে
সাধারণ অতীত -	করিলাম	করলাম
	করিলে	করলে
	করিলি	করলি
	করিলেন	করলেন
	করিল	করল/করলে
ঘটমান অতীত -	করিতেছিলাম	করছিলাম/করছিলুম
	করিতেছিলে	করছিলে
	করিতেছিলি	করছিলি
	করিতেছিলেন	করছিলেন

	করিতেছিল	করছিল
পুরাঘটিত অতীত -	করিয়াছিলাম	করেছিলাম/করেছিলুম
	করিয়াছিলে	করেছিলে
	করিয়াছিলেন	করেছিলেন
	করিয়াছিলি	করেছিলি
	করিয়াছিল	করেছিল
সাধারণ ভবিষ্যৎ -	করিব	করব
	করিবে	করবে
	করিবি	করবি
	করিবেন	করবেন
	করিবে	করবে

চলিতরীতিতে সমাস ব্যবহারের প্রবণতা তুলনায় কম। প্রধানত দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহি সমাসই সর্বাধিক প্রচলিত।

যেমন- ঠাকুরদেবতা নয়, বাপমাকে শ্রদ্ধা করো। (দ্বন্দ্ব)

সে এমন ভুলোমন যে গাছপাকা আমগুলো ট্রেনে ফেলে এল। (তৎপুরুষ)

নরুণচোখো, চিরুণদাঁতি না হলে যেন জীবন বৃথা! (বহুব্রীহি)

সাধুরীতিতে সচরাচর বাংলা ভাষার কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া পদবিন্যাসের ক্রমটি রক্ষিত হয়। চলিতরীতিতে সবসময় তা মোটেই মেনে চলা হয় না।

যেমন— কিছু বলিনি তো আমি ওকে।

ওকে কেউ দেখতেই পায়নি তা প্রায় বিশ বছর।

সাধু ও চলিতের মধ্যে এই যে এত পার্থক্য দেখানো হল, আজকের লেখ্যবাংলায় এই পার্থক্য মোটামুটি বজায় রাখা হলেও, এ দুই ভাষার মধ্যে বিভেদ কিন্তু অনড়বদ্ধ নয়। ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপে পার্থক্য বজায় থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই দুই রীতি মিশে যায়। কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্য দুই প্রকার ক্রিয়াও ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ দাশ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে কেউ বলেন না যে এখানে মিশে গেছে সাধু-চলিতভাষা। বরং চমৎকৃত হন এর ধ্বনিমাধুর্যে —

(১) কী কথা তাহার সাথে? — তার সাথে! (আকাশলীনা/জীবনানন্দ দাশ)

(২) আমার কাছে এখনও পড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে যাওয়া চাবি...
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা? (চাবি/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

উদাহরণ হিসেবে একটি সাধুরীতির নিদর্শন দেওয়া হল—

ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসম্বন্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জোর্তির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।

কপালকুণ্ডলা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রথম পাত্র'জ সংস্করণ ১৯৮৩)

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সাধরীতির সঙ্গে বিশেষ ধরনের বানানের কোনো সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী কালের সাধুরীতিতে কিন্তু বাংলা বানানের বর্তমান রূপটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে। তোমরা সারাদিন যত কথা বলো, যত লেখো সবই কিন্তু চলিতে। আমরা কথা বলার সময় একটানা কথা বলি না। থেমে থেমে বলি কারণ একদিকে যেমন শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তেমনি কথার অর্থ পরিস্ফুট করার জন্যও ক্ষণিক বিরাম নিতে হয়। এই বিরাম যদি অনিয়মিত হয় তাহলে তা হয় গদ্য, আর যদি নিয়মিত হয় তাহলে ফুটে ওঠে পদ্যের আমেজ। যে-কোনো ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও আছে পদ্য ও গদ্যের বৈচিত্র্য। তাহলে বাংলা ভাষার সামগ্রিক বৈচিত্র্য যা উঠে এল আমাদের আলোচনায় তা অনেকটা নীচের ছকের মতো: